লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

Fortnightly
The Ahmadi
Since 1922

নব পর্যায় ৮০ বর্ষ | ১৫তম সংখ্যা

প্রকাশনার ৯৫ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ৩ ফাল্গুন, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ | ২৮ জমা. আউ., ১৪৩৯ হিজরি | ১৫ তবলীগ, ১৩৯৭ হি. শা. | ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ ঈসাব্দ

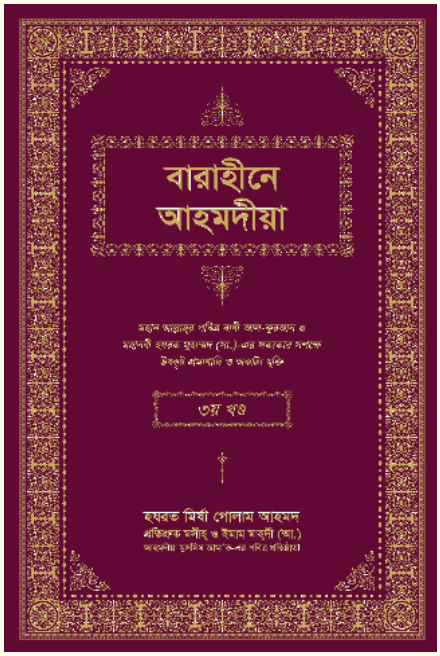

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ কৃপায় যুগান্তকারী ও অবিস্মরণীয় পুস্তক **'বারাহীনে আহমদীয়া'**র তৃতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তিনি তাঁর নিজ কৃপায় এ অসাধারণ পুস্তকটির অনুবাদ প্রকাশ করার আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন। এর পুরো নাম **'আলবারাহীনুল আহমদীয়াহ্ আলা হাক্কীয়্যতে কিতাবিল্লাহীল কুরআনে ওয়ান্ নবুয়্যাতীল মুহাম্মদীয়াহ্'** অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার সপক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি।

'বারাহীনে আহমদীয়া'র মোট পাঁচটি খণ্ড রয়েছে। ২৩ খণ্ডে প্রকাশিত রূহানী খাযায়েন-এর প্রথম খণ্ডে রয়েছে বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম চার খণ্ড আর পঞ্চম খণ্ডটি রয়েছে একুশতম খণ্ডে। ১৮৮২ সালে প্রকাশিত, 'বারাহীনে আহমদীয়া' তৃতীয় খণ্ডের মূল পুস্তকটি যেন হঠাৎ করেই শেষ হয়েছে বলে প্রতিভাত হয়। কেননা, তৃতীয় খণ্ডের মূল পুস্তক এবং পাদটীকা-২-এর বিষয়বস্তু চলমান রাখা হয়েছে আর যা ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত পুস্তকটির চতুর্থ খণ্ডে গিয়ে সমাপ্ত করা হয়েছে।

'বারাহীনে আহমদীয়া' পুস্তকটির মূল উর্দু সংস্করণে প্রতিপাদ্য মূলবিষয়, টীকা এবং পাদটীকা একই পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু পাঠকের সুবিধার্থে অনুদিত এই গ্রন্থে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর সদয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মূল পাঠ একটানা ভাবে শেষ করার পর যথাক্রমে টীকা-১১ এবং পাদটীকা ১ ও ২ অংশ সন্নিবেশিত রয়েছে।

বহুল প্রতিক্ষিত এ পুস্তক, যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর দাবির পূর্বেই রচনা করেছিলেন এবং যেই পুস্তক সম্পর্কে সেই যুগে ভারতবর্ষে বহু মানুষ স্বতঃস্ফুর্ত এ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছেন যে, বিগত তেরশ' বছর যাবত ইসলামের সপক্ষে এমন অসাধারণ সেবা প্রদান কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি, যা এ পুস্তকের মহান লেখক করে দেখিয়েছেন।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) প্রণীত
'শরায়াতে বয়আত অওর আহমদী কি যিম্মাদারীয়া'
পুস্তকের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে

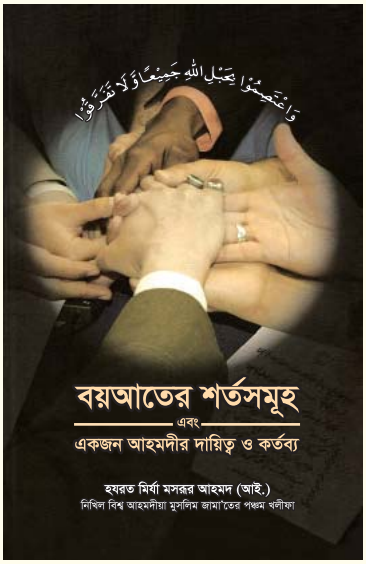

পুস্তকটি সম্পর্কে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দিক নির্দেশনা (ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত)

আমরা যারা ইমাম মাহদী (আ.) বা তাঁর খলীফার নিকট বয়আত গ্রহণ করি তারা এই শর্তগুলো পড়ে থাকি- সাধারণভাবে এর অর্থ বুঝতে পারি কিন্তু এর যে তত্ব ও মাহাত্ম্য তা অনুভব করতে পারি না। যদি আমরা এর মাহাত্ম্য অনুভব করতে পারি তাহলে এই শর্তগুলো প্রতিপালনে আমাদের ঐকান্তিকতা ও আগ্রহ এবং ইচ্ছা শক্তি আরো বেগবান হয়ে যাবে।

পুস্তকটি প্রত্যেক আহমদীর জন্য একটি 'গাইড বুক' বিশেষ। হুযূর (আই.)-এর মমতা মাখা এ পুস্তকটি থেকে উপকৃত হতে আমাদের সকলের প্রচেষ্টারত থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় সন্তুষ্টির চাদরে আমাদের আচ্ছাদিত হওয়ার সৌভাগ্য দানে কৃপাধন্য করুন। আমীন।

নিবেদক

মোবাশশের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

আপনার কপি সংগ্রহ করেছেন কি? প্রাপ্তিস্থান: কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী

সম্পাদকীয়

অর্ধশতাধিক অসাধারণ পবিত্র গুণাবলীর সুষমায় সুসজ্জিত সত্তা অর্ধশতাব্দীকাল ব্যাপী জগতময় ইসলামের জ্যোতির্ময় দীপ জালিয়ে আলোকজ্জল করেছেন যিনি শ্রদ্ধার্ঘ্য সেই প্রতিশ্রুত পুত্রকে– 'হে মুসলেহ মওউদ! তোমার জালিয়ে রাখা এ দীপ কখনও নির্বাপিত হতে দেব না সমুজ্জ্বল আলো ছড়াতে সদা এ প্রদীপের শিখা হয়ে থাকব আমরা'

মুসলেহ মওউদ হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দ্বিতীয় খলীফা ছিলেন। তিনি ১৮৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৪ সালে মাত্র ২৫ বছর বয়সে তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইমাম হন এবং ১৯৬৫ সালে পরলোক গমণ করেন। তাঁর সমগ্র জীবন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ ছিল, এ কারণে যে, এ ঐশী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর ঔরসজাত এই পুত্রের অনন্য জীবন আর ব্যতিক্রমী অসাধারণ কাজের কথা তার জন্মেরও আগে ১৮৮৪ সালে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

প্রতিশ্রুত এই পুত্র কেবল একজন মহান ধর্মতত্ত্ববিশারদই ছিলেন না, বরং জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্পকলার বিভিন্ন শাখার উপরও বিশেষ কর্তৃত্ব রাখতেন। এই জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আ,) নির্দেশিত ইসলাম আহমদীয়াতের শান্তির বার্তা বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়ার অপার তৃষ্ণা তিনি লালন করতেন। সবেমাত্র ১৯ বছর বয়সে যখন তিনি পদার্পণ করেন সেই সময়ে তার সম্মানিত পিতা, প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)কে তিনি হারান। ঐশী আশিসপ্রাপ্ত পিতার মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি সেই বিখ্যাত এবং অবিস্মরণীয় অঙ্গীকার করেছিলেন যে, সমগ্র পৃথিবী তাঁকে ত্যাগ করলেও তিনি তাঁর মিশনের কাজ এককভাবে চালিয়ে পূর্ণতায় নিয়ে যাবেন। বাস্তবে কার্যকর করে তিনি 'মুসলেহ মওউদ' সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতার নিদর্শনমুলক সত্তায় পরিণত হয়ে রয়েছেন।

পরমতসহিষ্ণুতা ও সহনশীলতার শিক্ষাসমৃদ্ধ ইসলামী আদর্শের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বাস্তব প্রতিফলনে ১৯৩৯ সালে তিনি "সর্বধর্ম প্রতিষ্ঠাতা দিবস" প্রবর্তন করেন। ইসলামের শিক্ষার আলোকে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাসের প্রতি সম্মান দেয়ার আরো এক মহান পদক্ষেপ ছিল এটি, ১৯৩৫ সালে শিখদের উপাসনালয় গুরুদুয়ারা নির্মাণে অনুদান হিসেবে আর্থিক সহায়তাও প্রদান করেন তিনি। এছাড়াও ১৯৪৬ সালে নোয়াখালী দাঙ্গায় হিন্দুদের পুনর্বাসনের জন্য তিনি গান্ধীজীকে ১ লক্ষ টাকা দান করেন, যা ছিল হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর চিরায়ত বাণী **'আমি সবার মঙ্গলাকাঙ্খী'**-এরই কার্যকর রূপ।

'দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ' মহানবী (সা.)-এর মহান এই উক্তির মর্যাদা সমুন্নত রাখতে আহমদী মুসলিমরা সদা তৎপর। এরই প্রতিফলন ঘটেছিল পঞ্চাশের দশকে টাটা ষ্টীলে ধর্মঘট ও অবরোধ চলাকালে পঞ্চাশের অধিক আহমদী শ্রমিকেরা কালোব্যাজ ধারণ করে যথারীতি নিজেদের দায়িত্ব পালন করে।

স্বনামখ্যাত "আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত"-এর প্রশাসনিক কাঠামোকে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এতটাই নিপুণভাবে গড়ে তুলেছেন যে, এর আওতাধীনে অবিচার, দুর্নীতি এবং অপরাধ সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা বা ভয় নেই। তাঁর বহু রচনাবলীর অন্যতম **'ইসলামিক ইকোনমিক সিস্টেম'** বা 'ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা' পুস্তকে তিনি কেবল চলমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর বিশ্লেষণাত্মক আলোচনাই করেননি, বরং বিদ্যমান ব্যবস্থার অনেক সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করে– **'আছে'** আর **'নাই'** উভয় মাঝে তথাকথিত রক্তক্ষয়ী কোন বিপ্লব বা জঙ্গী জিহাদ ছাড়াই "আহমদীয়া ওসীয়্যত ব্যবস্থা" কীভাবে অসাধারণ সেতুবন্ধন স্থাপন করে, এর বাস্তবসম্মত রূপরেখা দিয়েছেন। এরই আলোকে আহমদীয়া খিলাফত'এর ছায়াতলে ভূরাজনৈতিক সীমা পেরিয়ে সর্বত্র কাজ করে চলছে এই ঐশী জামা'ত।

আসছে ২০ ফেব্রুয়ারী বিশ্বের দুই শতাধিক দেশের আহমদীরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কৃত 'মুসলেহ মওউদ'-এর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতাকে কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করে এ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করবে আর মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচার করবে।

এ উপলক্ষে ইসলাম আহমদীয়াত বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে গতিশীল প্রয়াশ নিতে আমাদেরকে বিশেষ ভূমিকা রাখতে হবে।

আল্লাহ তা'লা তাঁর গৃহীতমানে আমাদেরকে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের তৌফিক দান করুন। আমীন!

সূচিপত্রে

১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

'বারাহীনে আহমদীয়া' (৪র্থ খণ্ড) ৬
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১১
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখের **জুমুআর খুতবা**

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রস্থ ২৫
স্বল্প পরিসরে সফল সমাপ্তিতে পৌঁছালো
৯৪তম সালানা জলসা ২০১৮

বিশ্বশান্তি : সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান ৩৩
হযরত মির্যা তাহের আহমদ

আমাদের খোদা ৩৭
ডিসেম্বর ১৯৯৮ সালে জলসা সালানায় প্রদত্ত বক্তৃতা
মূল হাফেয ড. সালেহ মুহাম্মদ আলদীন

কলমের জিহাদ ৪০
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

আমি কিভাবে আহমদী হলাম ৪৩
মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী

আমরা পারি না নাকি করি না ৪৬
কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

মুসলিম উম্মাহ্‌র সহমর্মিতায় সহজ-সরল এক নিবেদন ৪৮
মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্

সংবাদ ৫১

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক ৫৫

মানব জাতির সুরক্ষায় এক সতর্কবাণী ৫৬

পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

কুরআন শরীফ

সূরা বনী ইসরাঈল-১৭

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَ الْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ﴿۲۷﴾

২৭। আর তুমি নিকটাত্মীয়কে তার প্রাপ্য অধিকার দিয়ে দিও এবং অভাবী ও পথিককেও (দান করো) এবং কোন রকম অপব্যয় করো না।

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴿۲۸﴾

২৮। নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ[১৬১০]।

وَ اِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا ﴿۲۹﴾

২৯। আর তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রত্যাশিত কোন বিশেষ কৃপা লাভের উদ্দেশ্যে তাদেরকে (অর্থাৎ নিকটাত্মীয়দেরকে) যদি এড়িয়ে চল তবুও তাদের সাথে নম্রভাবে কথা[১৬১১] বলবে।

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ﴿۳۰﴾

৩০। আর তুমি তোমার হাত (চরম কৃপনতার সাথে) ঘাড়ের সাথে বেঁধে রেখো না, আবার (অমিতব্যয়ী হয়ে) এটি সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত করেও দিও না। নতুবা তুমি নিন্দিত (ও) অক্ষম[১৬১২] হয়ে পড়বে।

اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ﴿۳۱﴾ ع

৩১। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক যার জন্য চান রিযকের (পথ) অবারিত করে দেন এবং যার জন্য চান সংকুচিতও করেন। নিশ্চয় তিনিই নিজ বান্দাদের সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত (ও) পর্যবেক্ষণকারী।

১৬১০। যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত দানের সদ্ব্যবহার করে না সে আল্লাহ তা'লার কাছে অকৃতজ্ঞতার অপরাধে অপরাধী এবং যে ব্যক্তি নিজের অর্থসম্পদের অপব্যয় করে সে প্রকৃতপক্ষে তার উপরে সম্পাদনের জন্য অর্পিত কর্তব্য এড়িয়ে চলার পন্থা অবলম্বন করে।

১৬১১। আপাতদৃষ্টিতে নিতান্ত দরিদ্র বা নিঃস্ব হলেও যদি সন্দেহ হয় যে, সেই ব্যক্তিকে সাহায্য করলে তার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে তাহলে তাকে অগ্রাহ্য করা যেতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই সাহায্যপ্রার্থী পেশাদার ভিক্ষুক হলে বা অন্য কোন বদ অভ্যাসে আসক্ত হলে সেই ভিখারীকে সান্ত্বনাদায়ক কথা বলে ফিরিয়ে দেয়া যেতে পারে।

১৬১২। মু'মিনকে এমন কৃপণ হওয়া উচিত নয় যে, প্রকৃত প্রয়োজনের সময়ে সে তার অর্থ খরচ করবে না বা কোন চিন্তা-ভাবনা না করে অপ্রয়োজনে টাকা পয়সা অপব্যয় করবে। ফলে যখন জাতীয় স্বার্থে অর্থসম্পদের প্রয়োজন দেখা দিবে তখন তার নিজস্ব অবদান রাখার মতো কোন সামর্থ্য থাকবে না। এতে তাকে মনোকষ্ট পেতে হয়।

হাদীস শরীফ

প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এক ব্যক্তির আগমন

কুরআনঃ নিশ্চয় আমরা তোমার নিকট প্রেরণ করেছি এক রাসূলকে যিনি তোমাদের ওপর সাক্ষীস্বরূপ, যেরূপে আমরা ফেরাউনের প্রতি এক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম (সূরাতুল মুয্‌যাম্মিল : ১৬)

হাদীসঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন, যিনি তাদের জন্য তাদের ধর্মকে পুনর্জীবিত করবে, (অর্থাৎ উম্মতের মাঝে যে বি'দাত সৃষ্টি হবে তা সংশোধন করবে) (আবু দাউদ ২য় খন্ড বাবু মালাহেম)।

ব্যাখ্যাঃ কুরআন ও হাদীসের আলোকে এই উম্মত বড়ই সৌভাগ্যবান যে, আল্লাহ্ তাআলা এই উম্মতকে কখনও পরিত্যাগ করবেন না। আল্লাহ্ তাআলার সদয়-দৃষ্টি এই উম্মতের প্রতি সর্বদা থাকবে। তিনি এই উম্মতকে বিভ্রান্তির মধ্যে রাখবেন না। যখনই তিনি প্রয়োজন অনুভব করবেন, তখনই এই উম্মতের সংশোধনের জন্য তিনি তাঁর মনোনীত ব্যক্তিকে এই পৃথিবীতে পাঠাবেন।

কুরআন ও হাদীসের এত স্পষ্ট দলিল-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আজ এ উম্মতের অনেকেরই ধারণা যে, এই উম্মতের দুর্দশা লাঘবের জন্য যে কোন ব্যক্তির আগমনের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। আসলে এমন বিশ্বাস কুরআন ও হাদীস বিরোধী। অপরদিকে অনেকেই বড় গলায় দাবী করেন, নতুন কোন ব্যক্তি আসতে পারবে না, তবে পুরাতন নবী হযরত ঈসা (আ.) আসবেন। এটা কুরআন ও হাদীস-বিরোধী বিশ্বাস। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) স্পষ্ট বলেছেন, এই উম্মতের মধ্য হতে এদের সংস্কারক আবির্ভূত হবেন।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ! তোমরা আশ্চর্যান্বিত হয়ো না যে, খোদা তাআলা এমন প্রয়োজনের সময়ে এবং এই গভীর অন্ধকারের যুগে এক স্বর্গীয়-জ্যোতিঃ প্রেরণ করেছেন। সর্ব সাধারণের কল্যাণার্থে বিশেষতঃ ইসলামের বাণীকে গৌরবান্বিত করার জন্য এবং হযরত খায়রুল আনামের [সৃষ্টির সেরা অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর] নূর প্রচারের উদ্দেশ্যে এবং মুসলমানদের সাহায্যকল্পে ও তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা বিশুদ্ধ করার মানসে তিনি তাঁর এক বান্দাকে জগতে প্রেরণ করেছেন। বরং আশ্চর্যের বিষয় এটাই হতো যে, সেই খোদা যিনি ইসলাম ধর্মের সাহায্যকারী, যিনি সর্বদা কুরআনের শিক্ষাকে সংরক্ষণ করবেন এবং এটাকে নিস্তেজ, নিষ্প্রভ ও জ্যোতির্বিহীন হতে দিবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি এই অন্ধকার দর্শন করে এবং ভিতর ও বাইরের আপদসমূহ দেখেও চুপ করে থাকতেন এবং নিজ প্রতিশ্রুতি স্মরণ না করতেন, যা তিনি তাঁর বাণীতে জোরদার ভাষায় বর্ণনা করেছেন। আমি পুনরায় বলছি যে, যদি এই পবিত্র রাসূলের সেই পরিষ্কার ও অতি স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী অপূর্ণ থাকতো যাতে তিনি বলেছেন, "প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে খোদা এমন এক বান্দাকে সৃষ্টি করবেন যিনি তাঁর ধর্মকে নব জীবন দান করবেন"–তবেই ইহা বিস্ময়ের বিষয় হতো। অতএব এটা আশ্চর্যের বিষয় নয়, বরং হাজার কৃতজ্ঞতা বা খোদা তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কারণ এবং ঈমান ও একীন বৃদ্ধি করার সুযোগ, খোদা তাআলা বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া করে আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং স্বীয় রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করতে এক মিনিট বিলম্ব ঘটতে দেন নি।

কেবল যে তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করে দেখিয়েছেন তা নয়, বরং তিনি শত শত ভবিষ্যদ্বাণী ও অলৌকিক ব্যাপারের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাকো, তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং কৃতজ্ঞতার সেজদা কর যে, যে যুগের প্রতীক্ষা করতে করতে তোমাদের মাননীয় পিতৃপুরুষগণ গত হয়েছেন এবং অগণিত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি যে যুগের জন্য আগ্রহ পোষণ করতে করতে চলে গিয়েছেন, সেই যুগ তোমরা লাভ করেছো। এবং এর যথোচিত সমাদর না করা এবং তা থেকে উপকার গ্রহণ করা বা না করা তোমাদের ওপর নির্ভর করছে। আমি বার বার এই কথা বলতে চাই এবং এই ঘোষণা হতে আমি কখনও বিরত হতে পারি না যে, আমিই সেই ব্যক্তি, যাকে যথাসময়ে জগৎ সংস্কারের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে" (ফতেহ ইসলাম)।

আল্লাহ্ করুন, যেন উম্মতে মুহাম্মদীয়া যুগ ইমামকে চিনে তার হাতে বয়আত হয়ে উম্মতে ওয়াহেদাতে রূপান্তরিত হয়, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

খোদা তা'লার সাহায্যেই খোদা তা'লাকে লাভ করা যায়

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

খোদার এক নাম পরাক্রমশালী। তিনি স্বীয় সম্মান কাউকেও দেন না; কেবল তাদেরকেই দেন, যাঁরা তাঁর ভালবাসায় নিজেদেরকে (সত্তাকে) হারিয়ে ফেলে। খোদার এক নাম যাহের। যারা তাঁর তৌহীদ ও এক-অদ্বিতীয় গুণের প্রকাশস্থল এবং যারা তাঁর প্রেমে বিলীন হয়ে যায়, তারা তাঁর গুণাবলীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়। এদেরকে ব্যতীত তিনি অন্য কারও নিকট নিজেকে প্রকাশ করেন না।

স্বীয় জ্যোতি: হতে তিনি তাদেরকে জ্যোতি: দান করেন, স্বীয় জ্ঞান হতে তিনি তাদেরকে জ্ঞান দান করেন। তখন তারা নিজেদের সমগ্র মন প্রাণ ও ভালবাসা দ্বারা সেই নি:সঙ্গ বন্ধুর উপাসনা করে এবং তার সন্তুষ্টি এইভাবে চায়, যেভাবে তিনি নিজেই চাহেন।

মানুষ খোদার উপাসনার দাবী করে। কিন্তু কোন্ উপাসনা। কেবলমাত্র অনেক সেজদা, রুকু ও কেয়াম দ্বারা কি এই উপাসনা হয়? অথবা যারা অনেকবার তসবীহের দানা টিপে, তাদেরকে কি খোদা-প্রেমিক বলা যেতে পারে? বরং উপাসনা তার দ্বারা হতে পারে, যাকে খোদার ভালবাসা এই পর্যায়ে নিজের প্রতি আকর্ষণ করে যে, তার নিজের সত্তা মধ্য হতে উঠে যায়। প্রথমত: খোদার অস্তিত্বের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকতে হবে।

অত:পর খোদার সৌন্দর্য ও দয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত হতে হবে। এতদ্ব্যতীত তাঁর সাথে ভালবাসার সম্পর্ক এইরূপ হবে, যেন প্রেমের বেদনা সর্বদা হৃদয়ে বিরাজ করে এবং এই অবস্থা প্রতি মুহূর্তে চেহারায় বিকশিত হয়। খোদার মহিমা হৃদয়ে এইরূপে থাকতে হবে যেন সমগ্র বিশ্ব তাঁর সত্তার সম্মুখে মৃত সাব্যস্ত হয়। প্রতিটি ভীতি তাঁর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে। তাঁর বিরহ বেদনায় কাতরতার স্বাদ লাভ করতে হবে। তাঁর সাথে একান্তে স্বস্থি লাভ করতে হবে। তিনি ব্যতীত অন্য কারো নিকট হৃদয়ের শান্তি পাওয়া যাবে না। যদি অবস্থা এরূপ হয়ে যায় তবে এর নাম উপাসনা।

কিন্তু খোদা তাআলার বিশেষ সাহায্য ছাড়া এই অবস্থার সৃষ্টি হয় না। এই জন্য খোদা তা'লা এই দোয়া শিখিয়েছেন: **ইয়াকানা বুদু ওয়া ইয়া কানাস্তাঈন** অর্থাৎ আমরা তোমার উপাসনা তো করি। কিন্তু তোমার পক্ষ হতে বিশেষ সাহায্য না পেলে আমরা কখনো উপাসনার হক্ আদায় করতে পারি না। খোদাকে নিজের প্রকৃত-প্রেমিক সাব্যস্ত করে তাঁর উপাসনা করাই **'বেলায়েত'** (বন্ধুত্ব)।

এরপর আর কোন স্তর নেই। কিন্তু তাঁর সাহায্য ছাড়া এই স্তর লাভ করা যায় না। এটা লাভ করার চিহ্ন এই যে, খোদার মহিমা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে, খোদার প্রেম হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে, অন্তর তাঁর ওপর ভরসা করবে, তাঁকে পছন্দ করবে, সকল কিছুর উর্ধ্বে তাঁকে প্রাধান্য দিবে এবং তাঁর স্মরণকেই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করবে।

যদি ইব্রাহীমের ন্যায় নিজের হাতে নিজ প্রিয়-পুত্রকে যবাই করার আদেশ হয়, বা নিজেকে আগুনে ফেলার জন্য ইঙ্গিত হয়, তবে এইরূপ কঠোর আদেশকেও ভালবাসার আবেগে পালন করবে এবং স্বীয় প্রিয় প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য এতখানি সচেষ্ট হতে হবে, যাতে তাঁর আনুগত্যে কোন ফাঁক না থাকে।

এটা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ দরজা এবং এই শরবতটি অত্যন্ত তিক্ত শরবত। অল্প লোকই এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করে এবং শরবত পান করে। ব্যভিচার হতে বাঁচা কোন বড় ব্যাপার নয় এবং কাউকেও অন্যায় ভাবে হত্যা না করা বড় কাজ নয়। মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়াও কোন বড় গুণ নয়।

কিন্তু সব কিছুর ওপর খোদাকে প্রাধান্য দেওয়া এবং তাঁর জন্য খাঁটি ভালবাসা এবং খাঁটি আবেগে পৃথিবীর সকল তিক্ততা স্বীকার করা বরং নিজের হাতে তিক্ততা সৃষ্টি করা ঐ মর্যাদা, যা সিদ্দীকগণ (সত্যবাদী) ছাড়া অন্য কেউ অর্জন করতে পারে না। এটা সেই ইবাদত যা সম্পাদনের জন্যই মানুষ প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে। যে ব্যক্তি এই ইবাদত সম্পাদন করে, তার এই কর্মের জন্য খোদার পক্ষ হতেও একটি কর্ম সম্পাদিত হয়। এর নাম পুরস্কার।

(হাকীকাতুল ওহী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ ৪৪-৪৫ পৃ: থেকে উদ্ধৃত)

‘বারাহীনে আহমদীয়া’

৪র্থ খণ্ড

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

(১ম কিস্তি)

বিষয়-সূচী

১. ঐশী বাণীর প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ উপস্থাপনে আর একথার প্রমাণস্বরূপ যে, মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভের জন্য প্রকৃত ও প্রকৃষ্ট ঈমান এবং তত্ত্বজ্ঞান এ পৃথিবীতেই যা অর্জন করা বাঞ্ছনীয় তা ঐশী বাণী বা এলহাম ছাড়া অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে ব্রাহ্ম পণ্ডিত, দার্শনিক ও নেচারীদের (অর্থাৎ প্রকৃতি পূজারী) উদ্ভাবিত বহু ধ্যান ধারণার খণ্ডন : পৃ ২৯৭ থেকে ৫৬২ এর ১১ নং টীকা ও পুস্তকের মূল পাঠ্যাংশে।

২. কুরআন শরীফের একটি সূরা অর্থাৎ সূরা ফাতিহার অনন্য নিগুঢ় তত্ত্ব এবং বিশেষত্বের বিবরণ পৃ. ৩৩৯ থেকে পৃ. ৫২৭ পর্যন্ত।

৩. একত্ববাদ-সংক্রান্ত কুরআন শরীফের আরো কিছু আয়াতের বিবরণ: পৃ. ৩৪৭ থেকে ৫৬২'র টীকা ১১ তে বর্ণিত।

৪. একত্ববাদের শিক্ষা এবং বাগ্মিতা ও ভাষার আলঙ্কারিকতার দিক থেকে ‘বেদ’ যে অন্তঃসার শূণ্য– এর বর্ণনা, এছাড়া বেদের আরো কিছু শ্লোকের উল্লেখ; পৃ ৩৯৭ থেকে ৪৬৮ 'র টীকা পাদটীকা ৩'এ।

৫. বেদে উল্লিখিত মিথ্যা বিশ্বাস থেকে উদ্ধৃতি, পৃ. ৩৯২ থেকে ৪৩৩ এর টীকা ১১ তে।

৬. পন্ডিত দিয়ানন্দ এবং তার নির্বাক হওয়ার উল্লেখ এবং সে সকল প্রশ্নেরও উল্লেখ যাতে তিনি নিরুত্তর নির্বাক ছিলেন আর তার মৃত্যু সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী যা পূর্ণহওয়ার আগেই কতিপয় আর্যকে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল: পৃ. ৫৩১ থেকে ৫৩৬ এর টীকা ১১'এ

৭. ইঞ্জিল ও কুরআনশরীফ প্রদত্ত শিক্ষার বিশ্লেষণাত্মক তুলনা, পৃ. ৩৩২ থেকে ৩৩৬ পর্যন্ত।

৮. এমন সব ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ যা কতক আর্যকেও অবহিত করা হয়েছে, পৃ. ৪৬৮-৫১৪ এর টীকা, পাদটীকা ৩'এ।

৯.পরবর্তী যুগের সাথে সম্পর্কযুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর বিবরণ, পৃ. ৫১৪-৫৬২ টীকা পাদটীকা নং ৩'এ।

১০. হযরত ঈসার কোন নিদর্শন প্রকাশিত হওয়া কিংবা তার কোন ভবিষ্যদ্বাণী করার প্রমাণও নেই, পৃ ৪৩৪-৪৬৯-এর মূল অংশে।

১১. প্রকৃত মুক্তি কাকে বলে আর কিভাবে তা লাভ হতে পারে? পৃ.২৯৩-৩০৬, টীকা, পাদটীকা ২'এ।

টীকা: এই বিষয়সূচী প্রথম সংস্করণে রয়েছে, আর এতে উল্লিখিত পৃষ্ঠা সংখ্যা বর্তমান অর্থাৎ রাবওয়া থেকে ২০০৮ সনে প্রকাশিত কমপিউটেরাইয্‌ড মূল সংস্করণের টীকায় নির্দেশিত আছে।

মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থা এবং ইংরেজ সরকার

হে বেদুঈন, তোমার কা'বায় পৌঁছা সম্পর্কে আমার আশংকা রয়ে গেছে!

কেননা, যে পথ তুমি ধরেছ তা তুর্কিস্তানে নিয়ে যায়।

বর্তমানে আমাদের ধর্মীয় ভাই অর্থাৎ মুসলমানরা ধর্মীয় দায়িত্ব পালন, ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ প্রদর্শন ও জাতিগত সহমর্মিতার দাবি পূরণে এমন ঔদাসীন্য, ভ্রুক্ষেপহীনতা ও আলস্য প্রদর্শন করছে যে, কোন জাতির মাঝে এর নজীর খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং সত্য বলতে কী! জাতিগত ও ধর্মীয় সহমর্মিতার বৈশিষ্ট্য এদের মাঝ থেকে হারিয়েই গেছে। অভ্যন্তরিন নৈরাজ্য, শত্রুতা ও বিভেদ তাদেরকে প্রায় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করেছে। অধিকন্তু, অযথা কর্মকাণ্ডে বাড়াবাড়ি ও পালনীয় কাজে শৈথিল্য মূল লক্ষ্য হতে তাদেরকে যোজন-যোজন দূরে ঠেলে দিয়েছে। তাদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদে যেমন স্বার্থান্ধতার চিত্র প্রকাশ পাচ্ছে, এর ফলে কেবল এই আশংকাই দেখা দেয় নি যে তাদের অমূলক শত্রুতা প্রতিদিন প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেতে থাকবে, কতিপয় অপর কতেককে পোকার মত ভক্ষণ করবে আর নিজ হাতে নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনবে, বরং এই নিশ্চিত ধারণাও করা হয় যে, যদি তাদের হাল-অবস্থা এমনই থাকে তাহলে একদিন তাদের হাতে ইসলামের ভয়াবহ ক্ষতি হবে। তাদের আচরণকে পুঁজি করে সমালোচনা ও নৈরাজ্যের অনেক সুযোগ বহিরাগত নৈরাজ্যবাদী শত্রুর হস্তগত হবে। অধুনা কিছু মৌলভীর জন্য আরো একটি পরিতাপের বিষয় হলো, ভাইদের বিরুদ্ধে তারা তড়িঘড়ি আপত্তি করে বসে। নিশ্চিৎ ও সঠিক জ্ঞান হস্তগত করার পূর্বেই নিজের ভাইয়ের ওপর আক্রমণে উদ্যত হয়। আর কেনই বা হবে না! প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে যে মুসলমানই চোখে পড়ে, স্বার্থপরতার আতিশয্যে মানুষ তার অস্তিত্বকে কোনভাবে নিশ্চিহ্নই করে দিতে চায়। আরো চায় যে, তার নিজের বিজয় ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হোক আর প্রতিদ্বন্দ্বী পরাজয় ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সম্মুখীন হোক– এ কারণেই কথায় কথায় তাদের বৃথা বিতন্ডায় লিপ্ত হতে হয়।

খোদা তাদের ভিতর থেকে বিনয়, নম্রতা, সুধারণা পোষণ এবং ভ্রাতৃত্বসুলভ ভালবাসা সম্পূর্ণভাবে উঠিয়ে নিয়েছেন।

...

মাত্র কিছুদিন পূর্বের কথা, মুসলমানদের কেউ কেউ (বারাহীনে আহমদীয়ার) ৩য় খণ্ডে ইংরেজ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ-মূলক যে বিষয় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে, তা সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করেছে। কেউ কেউ চিঠিও পাঠিয়েছে আর ইংরেজ শাসনকে অন্য শাসনকালের ওপর কেন প্রাধান্য দিলাম, এ অজুহাতে কয়েকজন মর্মপীড়াদায়ককঠোর কথাবার্তা লিখেছে। কিন্তু জানা কথা যে, যেই সরকারের সভ্যতা-ভব্যতা ও সুশাসনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে, তাদের সেই গুণকে কীভাবে গোপন করতে পারি? যে সরকারের মাঝেই থাকুক না কেন, গুণ বা বৈশিষ্ট্য, তার স্বীয় অবস্থা-অবস্থানের নিরিখে– গুণই বটে। হিকমত বা প্রজ্ঞা মু'মিনের হারানো সম্পদ। আর এটিও বুঝতে হবে, মুসলমান জাতি যেই রাজত্বের ছত্রছায়ায় বসবাস করে তাদের অনুগ্রহে সিক্ত হবে, যার নিরাপত্তার ছায়ায় শান্তি ও প্রাচুর্যের মাঝে জীবিকার নির্ধারিত উপকরণ উপভোগ করবে, এর নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কাররাজীর কল্যাণে লালিত-পালিত হবে আবার বিচ্ছুর ন্যায় একেই হুল ফুটাবে আর এর সদ্ব্যবহার ও স্নেহ-মায়ার বিন্দু পরিমান কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না– ইসলামের নীতি মোটেই এটি নয়। বরং আমাদেরকে আমাদের মহা সম্মানিত খোদা স্বীয় প্রিয় রসূলের মাধ্যমে এ শিক্ষাই দিয়েছেন যে আমরা যেন পূণ্যের প্রতিদান প্রভূত পূণ্যের মাধ্যমে দেই আর পুরস্কারদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যখনই সুযোগ আসে এমন সরকারের প্রতি পরম আন্তরিক নিষ্ঠায় সুরভিত সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করি আর সানন্দে-সাগ্রহে ও ন্যায়সঙ্গতভাবে আনুগত্য প্রদর্শন করাকে যেন আবশ্যক জ্ঞান করি। সুতরাং ৩য় খণ্ডে অন্তর্ভূক্ত নির্দিষ্ট অধ্যায়ে এ অধম ইংরেজ সরকারের প্রতি যতটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে, তা কেবল ব্যক্তিগত ধারণার বশবর্তী হয়ে করেনি বরং, কুরআন শরীফ ও হাদীসের সে সকল জোরালো তাগাদা আমাকে এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশে বাধ্য করেছে যা অধমের দৃষ্টিতে রয়েছে। সুতরাং, এটি আমাদের কিছু নির্বোধ ভাইয়ের অতি বাড়াবাড়ি যাকে তারা নিজেদের অদূরদর্শিতা ও প্রকৃতিগত কার্পণ্যের কারণে ইসলামের অংশ ভেবে বসেছে।

হে নিষ্ঠুর ব্যক্তি! অজুহাত দেখানো সত্যিকার প্রেমিকদের রীতি নয়,

বিনা কারণে তুমি কীভাবে যারা মুত্তাকী হিসেবে পরিচিত তাদের প্রতি অমন অসম্মানজনক আচরণ করতে পার?

যেমনটি কিনা আমরা এখন আমাদের কিছু ভাইয়ের বাড়াবাড়ির কথা উল্লেখ করেছি, একইভাবে কিছুগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শৈথিল্যের ব্যাধিতেও তারা আক্রান্ত । ধর্ম নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই বরং তাদের চিন্তাধারার পুরোটাই জাগতিকতার পেছনে নিবেদিত; কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো তাদের বস্তুস্বার্থও সিদ্ধি হয় নি। ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আর সিদ্ধি হবেই বা কীভাবে? ধর্মতো তাদের হাতছাড়া হয়েছেই; জাগতিক আয়-উপার্জনের জন্য যেই যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন তা-ও তারা অর্জন করে নি। 'শেখ চিল্লি'র ন্যায় হৃদয়ে কেবল জাগতিক চিন্তাধারা বিরাজমান। যে পন্থা অনুসরণে জাগতিক স্বার্থ সিদ্ধি হয় সে পন্থা তারা অনুসরণ করেনি আর এরা নিজেদের মাঝে সে অনুপাতে পরিবর্তন আনে নি। সুতরাং এখন তাদের

অবস্থা হলো, একূল-ওকূল দু'কূলই তারা হারালো। ইংরেজ যে তাদের নিম-বন্য বলে এটিও তাদের মহানুভবতা ধরে নিতে পারেন, কেননা বেশীরভাগ মুসলমানকে বন্যদের চেয়েও অধম বলে মনে হয়। বিবেক-বুদ্ধি, দৃঢ়চিত্ততা, আত্ম সম্মানবোধ এবং ভালবাসা'র কিছুই (তাদের মাঝে) অবশিষ্ট নেই। সত্যিকার অর্থে তাদের প্রতিবেশী আর্যদের দৃষ্টিতে, তুচ্ছ প্রাণী গাভীর যে সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে তাদের হৃদয়ে স্বজাতি, আপন ভাই ও স্বীয় ধর্মসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর ততটুকু সম্মানবোধও নেই।

কেননা, আমরা নিজ চোখে অহরহ দেখছি যে, দৃঢ়-সংকল্প,আর্যজাতি,গাভীর সম্মান অক্ষুন্ন রাখার জন্য যে পরিমাণ চেষ্টা করে লক্ষ লক্ষ রূপিয়া একত্রিত করে নেয়, মুসলমানরা আল্লাহ ও রসূলের সম্মান প্রকাশার্থে এর সহস্র ভাগের একভাগও একত্রিত করতে পারে না। বরং যেখানেই ধর্মীয় সাহায্যের কথা আসে সেখানেই নারীদের ন্যায় মুখ লুকায়। চিন্তা করলে আর্যরা যে দৃঢ়-সংকল্প জাতি তা আরো স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় কেননা গাভীর প্রাণরক্ষার চেষ্টা করা সত্যিকার অর্থে তাদের ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি তুচ্ছ কাজ। আর এটি (যে মহৎ কাজ) ধর্মীয় গ্রন্থে তার প্রমাণও পাওয়া যায় না বরং তাদের গবেষক পন্ডিতরা খুব ভালভাবে জানেন, কোন বেদে গাভীর মাংস হারাম হওয়া সংক্রান্ত নির্দেশ দেখা যায় না। বরং ঋগ্বেদের প্রথম অংশ হতেই প্রমাণিত হয় যে, বেদের যুগে গাভীর মাংস সচরাচর বাজারে বিক্রি হতো আর আর্যরা সাগ্রহে তা ভক্ষণ করতো। সম্প্রতি একজন বড় গবেষক অর্থাৎ মোম্বাইয়ের সাবেক গভর্নর জনাব মাউন্ট স্টুয়ার্ট আলফান্স্টন সাহেব বাহাদুর, হিন্দুদের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলীর আলোকে আর্য জাতির ঘটনাবলীর বিবরণ সম্বলিত একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন যার নাম হলো ভারতের ইতিহাস। এর ৭৯তম পৃষ্ঠায় মনুর সংকলন সম্পর্কে উল্লিখিত ভদ্রলোক লিখেন যে এতে বড় বড় অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদের ষাড়ের মাংস খেতে তাগাদা দেয়া হয়েছে অর্থাৎ না খেলে পাপী গণ্য হবে। অনুরূপভাবে, সম্প্রতি কলিকাতায় এক পন্ডিত আরো একটি পুস্তক ছাপিয়েছেন যাতে লেখা আছে যে, বেদের যুগে গাভীর মাংস খাওয়া হিন্দুদের জন্য অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় দায়িত্বাবলীর অন্তর্গত বিষয় ছিল, আর বড় বড় ও ভাল টুকরোগুলো পেতো ব্রাহ্মণরাই। অনুরূপভাবে মহাভারতের ত্রয়োদশ পর্বে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে গাভীর মাংস শুধু বৈধ ও পবিত্রই নয় বরং, পির্তৃপুরুষদের জন্য ব্রাহ্মণদের তা ভক্ষণ করানো সকল প্রাণীর মাংস খাওয়ানোর চেয়ে উত্তম আর এটি খেলে পুর্বপুরুষ ১০ মাস পর্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকে। এক কথায় বেদের সকল ঋষি তথা মনুজী ও বিয়াসজী, গাভীর মাংস ব্যবহার করা অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় দায়িত্বাবলীর অন্তর্গত করেছেন এবং পুণ্যের কারণ জ্ঞান করতেন। যদি পন্ডিত দেয়ানন্দকে, যিনি ১৮৮৩ সনের ৩০ অক্টোবর ইন্তেকাল করেছেন, উল্লিখিত সর্বসম্মত মত হতে বাইরে রাখি তাহলে কারো কারো দৃষ্টিতে আমাদের বিবৃতি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, তাই একথা দৃষ্টিগোচর রাখা চাই যে পন্ডিত সাহেব তাঁর কোন গ্রন্থে গাভী নিষিদ্ধ বা অপবিত্র হওয়া-মর্মে কিছু লিপিবদ্ধ করেন নি আর না বেদের ভিত্তিতে এর অসিদ্ধ ও জবাই নিষিদ্ধ হওয়া প্রমাণ করেছেন। বরং দুধ ও ঘি সস্তা হওয়ার কারণে এ সংক্রান্ত প্রথার প্রচলন হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। কোন কোন উপলক্ষ্যে গাভী হত্যা যুক্তিযুক্ত বলেও মনে করতেন, যেমনটি কিনা তাঁর সতিয়ারত প্রকাশ ও বেদের তফসীর থেকে স্পষ্ট।

এই বক্তৃতার পেছনে আমাদের উদ্দেশ্য আদৌ এটি উল্লেখ করা নয় যে, আর্যরা কেন তাদের পবিত্র বেদ, তাদের সম্মানিত ঋষি, বিয়াসজী আর মনুজীর মহান নির্দেশাবলী ও নিজেদের গবেষক এবং বিজ্ঞ পন্ডিতদের কথার বিরুদ্ধাচরণ করে এবং তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়? বরং, এখানে একমাত্র উদ্দেশ্য হলো এটি স্পষ্ট করা যে আর্যরা কতইনা দৃঢ়সংকল্প, দৃঢ়চিত্ত ও একতাবদ্ধ জাতি যে, ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে যে কথার কোন ভিত্তি নেই, এমন একটি তুচ্ছ বিষয়েও তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় আর স্বল্পতম সময়ে তাৎক্ষণিকভাবে এর জন্য সহস্র সহস্র রুপিয়া চাঁদা একত্রিত হয়ে যায়। সুতরাং যে জাতির মাঝে অর্থহীন বিষয়ে এ মানের ঐক্য ও অবেগ-উচ্ছাস বিদ্যমান, বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সে জাতির দৃঢ়তা ও আন্তরিক প্রেরণা কেমন হতে পারে– একব্যক্তি নিজেই তা অনুমান করতে পারে।

সুতরাং হীনবল মুসলমানদের জীবিতই মরে যাওয়া উচিত। খোদা ও রসূলের ভালবাসাইযদি না থাকে, তাহলে ইসলামের অনুসারী হওয়ার দাবী কেন করেন? নোংরা কার্যকলাপ ও অবাধ্য প্রবৃত্তির দাসত্বে আর অলীক সম্মানের আশায় অকল্পনীয় পরিমাণ সম্পদ নষ্ট করা আর খোদা ও রসূলের ভালবাসা এবং সহমর্মীতার বশবর্তী হয়ে একটি শস্যদানা পর্যন্ত ব্যয় না করা– এটিই কি ইসলাম? না, এটি মোটেই ইসলাম নয়। এটি একটি অভ্যন্তরীণ কুষ্ঠ। মুসলমানরা এই অধঃপতনেরই শিকার হচ্ছে। অধিকাংশ ধনাঢ্য মুসলমানরা ধর্মকে এমন একটি বিষয় ভেবে বসে আছে যার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন কেবল দরিদ্রদের জন্য আবশ্যক! আর সম্পদশালীরা,যাদের জন্য এই বোঝা স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ; তারা এর উর্ধ্বে! এই গ্রন্থ ছাপতে গিয়ে এ অধমের এ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা করার যথেষ্ট সুযোগ হয়েছে। অথচ এ কথা খুব ভালভাবে প্রচার করা হয়েছিল যে,পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির কারণে এর প্রকৃত মূল্য ১০০ রূপিয়া রাখা যথাযথ মনে হয়। কিন্তু দরিদ্রদের যেহেতু তা কেবল ১০ রূপিয়া মূল্যে দেয়া হচ্ছে আর একই সাথে মূল্য-ঘাটতি পুষিয়ে নেয়াও যেহেতু আবশ্যক, তাই সামর্থ্যবান ব্যক্তিরা যেন বিষয়টি

বিবেচনায় রাখেন! দুঃখের বিষয় হলো, সাত-আট ব্যক্তি ছাড়া সকলেই দরিদ্রদের দলে যোগ দিয়েছে। তারা যেভাবে ক্ষতি পুষিয়েছেন সেই দৃষ্টান্ত কতই না ঘৃণ্য, যখনই কোন মানি-অর্ডার সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছি যে, বইয়ের মূল্য বাবদ এই ৫ রূপিয়া কার পক্ষ থেকে এসেছে বা বইয়ের মূল্য বাবদ এই ১০ রূপিয়া কে পাঠিয়েছেন? এমন ক্ষেত্রে প্রায় সময় এটিই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে যে অমুক নবাব সাহেব বা অমুক রইস আযম সাহেব পাঠিয়েছেন! অবশ্য হায়দ্রাবাদের নবাব ইকবালোদ্দৌলা এবং নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, বলন্দ শহর জিলা থেকে আরেক রইস বইয়ের একটি অনুলিপির মূল্য বাবদ এক শত রূপিয়া করে পাঠিয়েছেন। আফযাল খান নামের এক কর্মকর্তা এক শত দশ রূপিয়া এবং মালিরকোটলার নবাব সাহেব তিন খণ্ডের জন্য একশত রূপিয়া পাঠিয়েছেন। লুধিয়ানার মহান রইস সর্দার আতর সিং মহানুভবতা ও উদারতার স্বাক্ষর রেখে সাহায্যস্বরূপ পনের রূপী পাঠিয়েছেন; অথচ তিনি একজন হিন্দু। সর্দার সাহেব হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন। যাদের বড় বড় নাম ও উপাধি দেয়া হয়, আর যারা কারুনের ন্যায় অঢেল সম্পদ হস্তগত করে রেখেছে এমন কৃপণ ও বখিল মুসলমানদের উচিত এখানে সর্দার সাহেবের মোকাবিলায় নিজেদের অবস্থান খতিয়ে দেখা। মুসলমানদের ভেতর এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার, যারা স্বজাতির প্রতি সহমর্মিতা রাখে অথচ আর্যদের মাঝে এমন মানুষও রয়েছে যারা ভিন জাতির প্রতিও সহানুভূতি প্রদর্শন করে। সুতরাং উত্তর দাও এ জাতির উন্নতি কী করে সম্ভব?... মুসলমান ব্যতিত পৃথিবীর সকল ধর্মের ধনাঢ্যদের মাঝে ধর্মীয় সহানুভূতি দেখা যায়। মুসলমান ধনীদের মাঝে এমন মানুষ খুব কমই পাওয়া যাবে, স্বীয় সত্য ও পবিত্র ধর্মের জন্য যাদের তিল পরিমাণ চিন্তাও আছে। স্বল্পকাল পূর্বে এ অধম একজন নবাবের কাছে বারাহীনে আহমদীয়ার প্রেক্ষাপটে সাহায্যের জন্য লিখেছে যিনি অত্যন্ত পূত প্রকৃতিসম্পন্ন, মুত্তাকী ও জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী আর খোদা ও রসূলের শিক্ষার সুগভীর জ্ঞানরাখেন। নবাব সাহেব যদি প্রত্যুত্তরে এ কথা লিখতেন যে, আমাদের মতে গ্রন্থ এত উন্নত মানের নয় যার জন্য সাহায্য করা যায়! তাহলে ততো আক্ষেপের কারণ ছিল না। কিন্তু প্রথমেতিনি লিখেছেন যে ১৫-২০টি গ্রন্থ অবশ্যই ক্রয় করবো, পুনরায় স্মরণ করালে উত্তর এলো যে, ধর্মীয় বিতর্ক সম্বলিত গ্রন্থাবলী ক্রয় বা সে উদ্দেশ্যে কোন সাহায্য প্রদান করা ইংরেজ সরকারের ইচ্ছার পরিপন্থী কাজ, তাই এই রাজ্যের কাছে ক্রয়ের কোন আশা রাখবেন না। সত্যিকার অর্থে আমরাও নবাব সাহেবকে আশা-ভরসা স্থল মনে করি না বরং প্রকৃত আশা-ভরসাস্থল হলেন মহাসম্মানিত খোদা আর তিনিই যথেষ্ট। (খোদা ইংরেজ সরকারকে নবাবের প্রতি সন্তুষ্ট রাখুন) কিন্তু আমরা সশ্রদ্ধ নিবেদন করবো যে এমন মনোভাব ভদ্রতার আবরণে সরকারের বিদ্রুপ বৈ-কিছু নয়। কোন জাতিকে স্বীয় ধর্মের সত্যতা প্রমাণে বাধা দেবে বা ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে সাহায্য-সহযোগীতা করা হতে বারণ করবে- ইংরেজ সরকারের নীতি এটি নয়। অবশ্য কোন রচনা যদি শান্তির বিঘ্ন ঘটায় বা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের পরিপন্থি হয় তাহলে তাতে সরকার হস্তক্ষেপ করবে। নতুবা স্ব-স্ব ধর্মের উন্নতি কল্পে বৈধ উপকরণ কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে সকল জাতির জন্যই অনুমতি রয়েছে। এছাড়া যেজাতির ধর্ম প্রকৃতপক্ষে সত্য, পরমোৎকর্ষ আর দৃঢ় প্রমাণের ভিত্তিতে যার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত, সেজাতি সুস্থ মনোবৃত্তি, বিনয় ও নম্রতার সাথে সৃষ্টির কল্যাণ সাধনের জন্য স্বীয় সত্য যুক্তিমালা প্রকাশ করলে ন্যায়পরায়ন সরকার কেন রাগান্বিত হবে? আমাদের মুসলমান ধনাঢ্যরা এ সম্পর্কে অতি স্বল্পই অবহিত যে, সরকারের ন্যায়নিষ্ঠ প্রজ্ঞার দাবি হলো আন্তরিক সদিচ্ছার সাথে স্বাধীনতা বহাল রাখা। আমরা স্বচক্ষে এমন যোগ্য ও সুস্থ প্রকৃতিসম্পন্ন ইংরেজ অনেককে আমরা স্বচক্ষে দেখেছি যারা চাটুকারিতা ও কপটতাপূর্ণ আচার-আচরণ পছন্দ করেন না এবং তাকওয়া, খোদাভীতি ও সততা এবং অকপট আচরণকে পছন্দ করেন। সত্যিকার অর্থে সকল কল্যাণ সততা ও খোদাভীতির মাঝেই নিহিত, আর আপন-পর সবার ওপর কোন না কোন সময় যার প্রতিফলন ঘটেই থাকে। খোদা যার প্রতি সন্তুষ্ট তার প্রতি অবশেষে তাঁর সৃষ্টিও সন্তুষ্ট হয়ে যায়। এক কথায় সদিচ্ছা ও সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ধর্মীয় ও জাতিগত সহমর্মিতার কাজে নিয়োজিত হওয়া আর ধর্মীয় ও জাগতিক বিষয়ে সত্যিকার ও আন্তরিক আবেগ-উচ্ছাস নিয়ে সৃষ্টির হিতৈষণা, এমন এক প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্যযে, কোন রাজত্বে এমন মানুষের বসবাস, নিঃসন্দেহে সেই সরকারের জন্য গর্বের বিষয়। সে দেশে আকাশ থেকে কল্যাণরাজি বর্ষিত হয় যে দেশে এমন মানুষ বিদ্যমান। কিন্তু চরম দুর্ভাগা সে সরকার যার অধীনস্ত সকলেই মুনাফিক, যারা ঘরে এক কথা বলে আর (সরকারের) সামনে ভিন্ন কথা বলে। তাই নিশ্চিত করে বুঝা উচিত যে মানুষের নিষ্ঠা ও সততায় ক্রমাগত উন্নতি করে যাওয়া আর সরকারকে এক অনুগ্রহশীল বন্ধু মনে করে তার সাথে অকৃত্রিম ব্যবহার করাই ইংরেজ সরকারের সৌভাগ্য। একারণেই আমাদের তত্ত্বাবধায়ক শাসক স্বাধীনতার কেবল বুলিসর্বস্ব পাঠ দেয় না বরং ধর্মীয় বিষয়ে স্বয়ং স্বাধীন কর্মকান্ডের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ব্যবহারিক উপদেশের মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতার ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। উদাহরণস্বরূপ, হয়ত এটি বলাই যথেষ্ট হবে যে খুব সম্ভব একমাস অতিবাহিত হয়ে থাকবে যখন আমাদের দেশের পাঞ্জাব প্রদেশের লেফটেনেন্ট গভর্ণর নবাব সার চালস্ এচীসন সাহেব

বাহাদুর, গুরুদাসপুরের বাটালায় এসেছেন। গীর্জার ভিত্তিপ্রস্তর রাখার সময় তিনি পরম সরলতা ও অকৃত্রিমতার সাথে খৃস্টধর্মের প্রতি স্বীয় সহমর্মিতা প্রকাশ করে বলেন, আমার আশা ছিল কয়েক দিনের ভেতর এদেশ ধর্মানুবর্তিতা ও সততার ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি করবে কিন্তু অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এটিই প্রতীয়মান হয় যে উন্নতি অতি স্বল্পই হয়েছে (অর্থাৎ এখনও মানুষ ব্যাপক হারে খ্রিষ্টান হয় নি আর খ্রিষ্টানদের পবিত্র দল, সংখ্যায় এখনও স্বল্প) কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের নিরাশ হওয়া উচিত নয়; কেননা পাদ্রী সাহেবানদের কাজ নিরর্থক নয় আর তাদের শ্রম পন্ড হবে না বরং, পুণ্য অনুপাতে হৃদয়ে তা প্রভাব বিস্তার করে থাকে আর অভ্যন্তরীণভাবে অনেকের হৃদয় প্রস্তুত হয়ে চলেছে। যেমন অন্যূন একমাস হবে, এক রইস বা ধনাঢ্য ব্যক্তি আমার কাছে এসেছেন এবং আমার সাথে এক ঘন্টা পর্যন্ত ধর্মীয় আলোচনা করেছেন। এমন মনে হচ্ছিল যে, তার হৃদয় কিছুটা প্রস্তুতির সময় চায়। সে বলে আমি ধর্মীয় পুস্তক অনেক দেখেছি কিন্তু আমার পাপের বোঝা অপসারিত হয় নি আর আমি ভালভাবে জানি যে পুণ্যকর্ম করতে পারব না।

আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত! প্রত্যুত্তরে আমি আমার আধো-আধো উর্দূতে তাকে (মানবজাতির জন্য) সেই রক্ত দেয়ার কথা বোঝালাম যা সকল পাপ হতে পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন করে ,আর সেই তাকওয়া সম্পর্কে বোঝালাম যা কর্মের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে না বরং বিনামূল্যে লাভ হয়। সে বলে যে, আমি সংস্কৃত ভাষায় ইঞ্জিল দেখেছি আর দু'একবার হযরত ঈসার কাছে দোয়াও করেছি। এখন থেকে আমি রীতিমত ইঞ্জিল পাঠ করবো আর চিৎকার করে ঈসার কাছে প্রার্থনা করবো (অর্থাৎ আপনার বক্তৃতায় আমার ওপর সুগভীর প্রভাব পড়েছে আর খৃস্টধর্মের প্রতি পূর্ণ আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে)। এখন ভাবা উচিত গভর্ণর বাহাদুর নবাব লেফ্‌টেনেন্ট সাহেব কত কষ্ট করে হিন্দু জমিদারকে স্বীয় ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করেছেন। যদিও এ ধরনের রইসগণ স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য শাসক শ্রেণীর সামনে এমন কপটতামূলক কথাবার্তা বলেই থাকে, যেন শাসক তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং তাদেরকে স্বীয় ধর্মভাই জ্ঞান করেন। কিন্তু এই বক্তৃতার উদ্দেশ্য হলো, সাহেবের আলোচনার আলোকে ইংরেজ সরকার-প্রদত্ত ধর্মীয় স্বাধীনতার ধারণা নেয়া বা ধারণা দেয়া। কেননা যেখানে স্বয়ং নবাব লেফটেনেন্ট গভর্ণর বাহাদুর আন্তরিক আগ্রহের সাথে ভারতে নিজের প্রিয় বিশ্বাস প্রচারে আন্তরিক আগ্রহ রাখেন বরং, সুযোগে কখনও কখনও এর জন্য মানুষকে অনুপ্রাণিতও করেন; সেখানে, অন্যদের স্ব-স্ব ধর্মের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনে কেন তিনি অসন্তুষ্ট হবেন? সত্যিকার অর্থে অকপটে সহানুভূতি প্রদর্শন একটি নেক বৈশিষ্ট্য, আর কপটাচার পরিহার করা উচিত। এই সততায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মোম্বাইয়ের সাবেক গভর্নর স্যার রিচার্ড টিমপল সাহেব মুসলমানদের সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন আর তা বিলাতের পত্রিকা ইভনিং স্ট্যান্ডার্ডে ছেপে (পরবর্তীতে) উর্দূ পত্রিকায়ও এসে গেছে। তিনি লেখেন যে, পরিতাপ! মুসলমানরা খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে না। এর কারণ হলো, তাদের ধর্ম সে সকল অসম্ভব কথায় পরিপূর্ণ নয় যাতে হিন্দু ধর্ম নিমজ্জিত। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের অনুসারীদের হয়ত হাসি ঠাট্টার ছলে সাধারণ যুক্তি দিয়েই ধর্মান্তরিত করা সম্ভব; কিন্তু ইসলাম দক্ষতার সাথে যুক্তির মোকাবিলা করে আর প্রমাণাদির মাধ্যমে খন্ডিত হতে পারে না। খ্রিষ্টানরা সহজেই অন্য ধর্মের অসার-অযৌক্তিক-অসম্ভব বিষয়াদি দৃশ্যপটে এনে সেসব ধর্মের অনুসারীদের ধর্মচ্যুত করতে পারে, কিন্তু মুহাম্মদীয়দের বা মুসলমানদের সাথে এমনটি করা তাদের জন্য কঠিন বিষয়। সুতরাং, এই অকপটতা মুসলমান ধনাঢ্যদের মাঝে দেখা যায় না, এটি নিয়ে ভাবা তো দূরের কথা।

খাকসার

গোলাম আহমদ

(চলবে)

ভাষান্তর: **মওলানা ফিরোজ আলম**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

এ যুগের নিরাপদ দুর্গ

'এ যুগের দুর্ভেদ্য দূর্গ আমি। যে ব্যক্তি আমাতে প্রবেশ করে সে চোর দস্যু ও হিংস্র জন্তু থেকে নিজ প্রাণ রক্ষা করে। কিন্তু যে ব্যক্তি আমার প্রাচীর থেকে দূরে থাকতে চায় তার চারদিকে মৃত্যু বিরাজমান এবং তার লাশও নিরাপদ নয়। আমাতে কে প্রবেশ করে? সে-ই যে পাপ বর্জন করে এবং পুণ্য অবলম্বন করে এবং বক্রতা ছেড়ে সাধুতার দিকে অগ্রসর হয় ও শয়তানের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে খোদা তা'লার এক অনুগত দাসে পরিণত হয়। যে-ই এরূপ করবে সে আমার ও আমি তার।'

–প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)

জুমুআর খুতবা

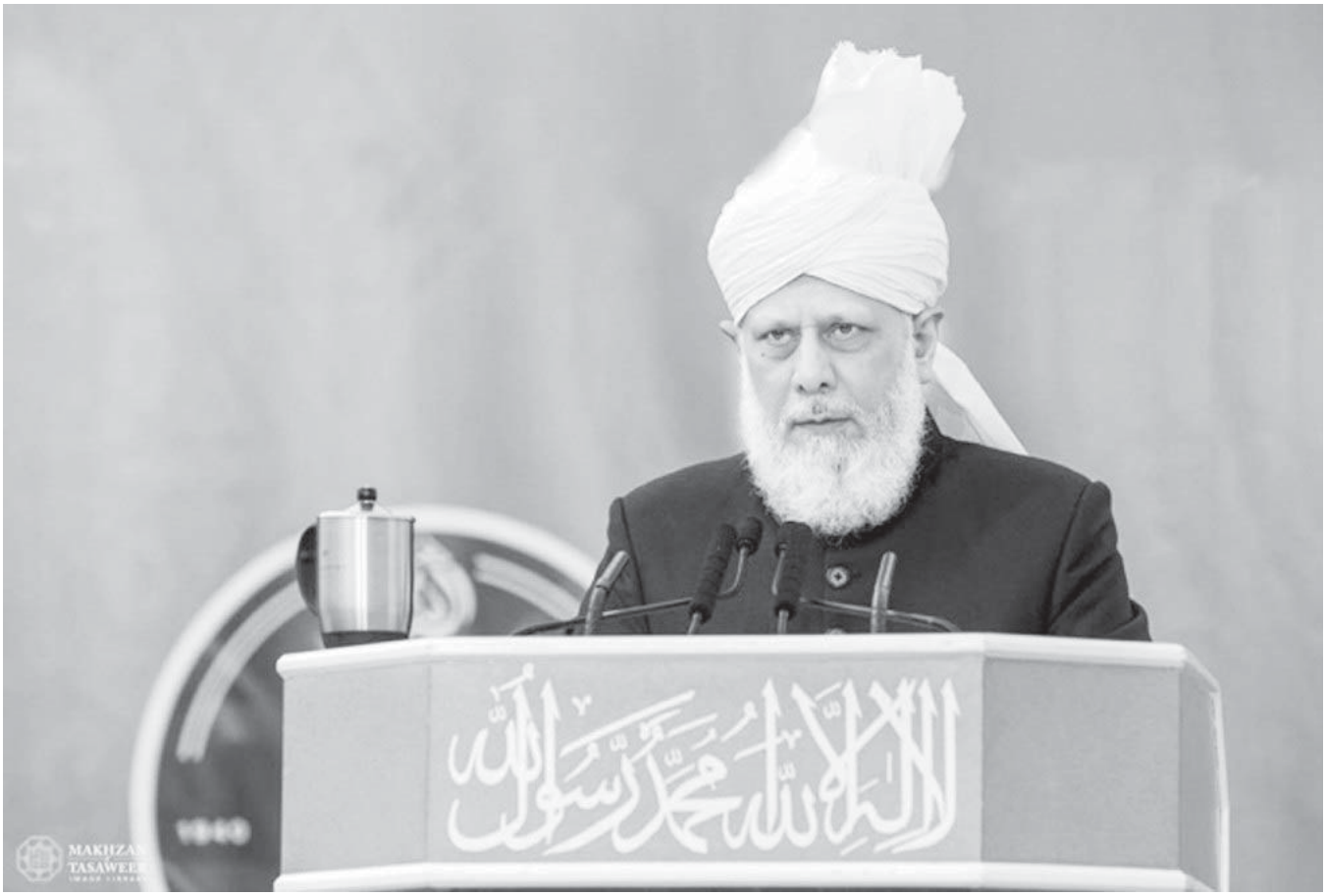

মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও তাঁর অবদান

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ ২০ ফেব্রুয়ারি আর এই দিনটি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে মুসলেহ্ মওউদ-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য সুপরিচিত। ইসলামের সত্যতা প্রমাণের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার কাছে নিদর্শন প্রার্থনা করেছিলেন। কেননা ইসলামের উপর অমুসলমানদের আক্রমণ চরম আকার ধারণ করেছিল, তাই তিনি (আ.) 'চিল্লাহ্ কশি' (একাধারে চল্লিশ দিন একান্তে নিভৃতে দোয়া করা -অনুবাদক)

করেন আর আল্লাহ্ তা'লার কাছে তার দোয়া গৃহীত হওয়ার নিদর্শনস্বরূপ তাঁকে এক অসাধারণ নিদর্শন দেখানোর সংবাদ দেন। এর বিস্তারিত বিবরণে আমি এখন যাব না। এই বিষয়ে পূর্বেও আমি কয়েকটি খুতবা দিয়েছি। তাছাড়া মুসলেহ্ মওউদ-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে প্রতি বছর জামা'তে আলোচনাসভাও হয়ে থাকে, যাতে জামা'তের আলেম এবং বিজ্ঞ বক্তাগণ এ বিষয়ে আলোচনা করে থাকেন। আর জামা'তের এসব অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ এসেই থাকে। এ বছরও যথারীতি আসবে ইনশাল্লাহ্ তা'লা। আজকালও এই সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠান চলছে।

মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পটভূমি

এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে বিভিন্ন সময় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যা কিছু বলেছেন তা তাঁর নিজের ভাষায় আজ আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। এর সকল দিক আয়ত্ব করা ও তুলে ধরা সম্ভব নয়, শুধুমাত্র কতিপয় দিক ও কতক উদ্বৃতি উপস্থাপন করব।

১৯৪৪ সনে মুসলেহ্ মওউদ-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আজ এই ভবিষ্যদ্বাণীর ৫৯তম বছর আরম্ভ হচ্ছে। আজ থেকে পুরো ৫৮ বছর পূর্বে ১৮৮৬ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি এই হুশিয়ারপুর শহরে (এই বক্তব্য তিনি হুশিয়ারপুরে প্রদান করেছেন) এবং এই বাড়িতে যা এখন আমার সামনে রয়েছে, (যেখানে তিনি বক্তৃতা করছিলেন সেই মাঠের সামনেই বাড়িটি ছিল।) এমন এক বাড়ি ছিল যা তখন 'তাবেলা' হিসেবে সুপরিচিত ছিল, অর্থাৎ তা বসতবাড়ি ছিল না, বরং এক ধনাঢ্য ব্যক্তির অতিরিক্ত বাড়িগুলোর একটি ছিল, যাতে প্রয়োজনে কোন অতিথি অবস্থান করতো অথবা সেখানে তারা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র স্টোর করার ব্যবস্থা রেখেছিল বা ঘটনাক্রমে হয়ত-বা গবাদি পশু রাখার জন্যও ব্যবহার করা হতো। কাদিয়ানের এক অপরিচিত ব্যক্তি, যাকে স্বয়ং কাদিয়ানের বাসিন্দারাও ভালোভাবে চিনত না, ইসলাম এবং ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার প্রতি মানুষের বিরোধিতা দেখে নিভৃতে নিজ প্রভুর ইবাদত করতে এবং তাঁর সাহায্য ও সমর্থন যাচ্না করার মানসে সেই ব্যক্তি এখানে আসেন আর চল্লিশ দিন পর্যন্ত জনমানব হতে বিচ্ছিন্ন থেকে নিজ প্রভুর কাছে দোয়া করতে থাকেন। চল্লিশ দিন দোয়ার পর খোদা তা'লা তাঁকে একটি নিদর্শন প্রদান করেন। সেই নিদর্শন হল, তোমাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি আমি কেবল পূর্ণই করব না, তোমার নাম শুধু পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তেই পৌঁছাব না, বরং এই প্রতিশ্রুতিকে আরো মহিমার সাথে পূর্ণ করার জন্য আমি তোমাকে এমন এক পুত্রসন্তান দান করবো, যে অসাধারণ গুণাবলীর ধারক ও বাহক হবে। ইসলামকে সে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবে। খোদা তা'লার বাণীর তত্ত্ব সম্পর্কে মানুষকে সে অবহিত করবে। রহমত এবং কল্যাণের নিদর্শন হবে। আর ধর্মীয় এবং পার্থিব জ্ঞান, যা ইসলাম প্রচারের জন্য আবশ্যক, তা তাকে প্রদান করা হবে। একইভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাকে দীর্ঘায়ু দান করবেন, এমনকি সে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে সুখ্যাতি লাভ করবে। (দা'ওয়া মুসলেহ্ মওউদ কে মুতা'ল্লেক পুর শওকত এ'লান, আনোয়ারুল উলুম, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ১৪৬-১৪৭)

অন্য এক স্থানে পুনরায় তিনি (রা.) বলেন, জামা'তের বিরোধীরা আপত্তি করে থাকে যে, যখন এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় তাতে এই ভবিষ্যদ্বাণীর পুরোটা প্রকাশ করা হয় নি, সবক'টি বাক্য তুলে ধরা হয় নি, মাত্র কয়েকটি কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি (রা.) বলেন, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হলে বিরোধীরা এ প্রসঙ্গেও ক্রমাগতভাবে আপত্তি করতে আরম্ভ করে। তাই ১৮৮৬ সনের ২২ মার্চ তিনি (আ.) আরো একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। বিরোধীদের আপত্তি ছিল, এমন ভবিষ্যদ্বাণীর বিশেষত্বই বা কী যে, আমার ঘরে এক পুত্রসন্তান জন্ম গ্রহণ করবে! মানুষের ঘরে কি পুত্রসন্তান জন্ম গ্রহণ করে না? কদাচিৎই এমন কোন ব্যক্তি হবে যার ঘরে কোন পুত্রসন্তান জন্ম নেয় না বা যার ঘরে শুধু কন্যাসন্তানই হয়ে থাকে। অন্যথায় সচরাচর মানুষের ঘরে পুত্রসন্তান হয়েই থাকে আর এই পুত্রসন্তানের জন্মকে কখনো কোন বিশেষ নিদর্শন হিসেবে অভিহিত করা হয় না। তাই আপনার ঘরেও যদি কোন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে, তবে এটি কীভাবে প্রমাণ হতে পারে যে, এর মাধ্যমে পৃথিবীতে খোদা তা'লার কোন বিশেষ নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে? মানুষের এ আপত্তির উত্তর দিতে গিয়ে তিনি (আ.) ২২ মার্চের বিজ্ঞাপনে লিখেন, "এটি শুধুমাত্র একটি ভবিষ্যদ্বাণীই নয়, বরং এক মহান ঐশী নিদর্শন, যা মহাসম্মানিত ও মহিমান্বিত খোদা আমাদের সম্মানিত, দয়ালু ও স্নেহশীল নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর সত্যতা এবং মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য প্রদর্শন করেছেন।"

এরপর একই বিজ্ঞাপনে তিনি (আ.) আরো লিখেন, খোদা তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহে আর হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর কল্যাণে খোদা তা'লা এই অধমের দোয়া গ্রহণ করে এমন এক কল্যাণমণ্ডিত আত্মাকে প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যার জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণ গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। আসল কথা হল, তিনি (আ.) যদি নিজের ঘরে কেবল এক সাধারণ পুত্র হওয়ারও সংবাদ দিতেন তবুও এই সংবাদ নিজ গুণে একটি ভবিষ্যদ্বাণী বলে গণ্য হতো। কেননা পৃথিবীর মানুষের একটি অংশ নিঃসন্দেহে এমন রয়েছে যাদের ঘরে কোন সন্তানসন্ততি হয় না, তার সংখ্যা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন। আর দ্বিতীয়তঃ তিনি (আ.) যখন এই ঘোষণা করেন তখন তার বয়স পঞ্চাশ বছরের ঊর্ধ্বে ছিল আর পৃথিবীতে সহস্র সহস্র এমন মানুষ বসবাস করেন যাদের ঘরে পঞ্চাশ বছরের পর সন্তান জন্ম নেয়া বন্ধ হয়ে

যায়। এছাড়া এমন অনেক মানুষও রয়েছে যাদের ঘরে শুধু কন্যাসন্তানই জন্ম নেয়। আর এমন মানুষও আছে যাদের ঘরে পুত্রসন্তান জন্ম নিলেও জন্মের কিছুদিন পরই মারা যায়। আর উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে এমন সবগুলো আশঙ্কাই বিদ্যমান ছিল। অতএব, প্রথমতঃ কোন পুত্রসন্তানের জন্মের ভবিষ্যদ্বাণী করা কোন মানুষের সাধ্যে নেই, কিন্তু তিনি (আ.) তর্কের খাতিরে এই আপত্তিকে মেনে নিয়ে বলেন, তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নেয়া হয় যে, শুধুমাত্র কোন পুত্রসন্তান হওয়ার সংবাদ দিলেই তা ভবিষ্যদ্বাণী বলে আখ্যায়িত হবে না তাহলে প্রশ্ন হল, আমি কবে নিছক এক পুত্রসন্তান জন্ম নেয়ার আগাম সংবাদ দিলাম? আমি তো একথা বলি নি যে, আমার ঘরে এক পুত্রসন্তান জন্ম নিবে বরং আমি বলেছি, খোদা তা'লা আমার দোয়াসমূহ গ্রহণ করে এমন এক আশিষময় আত্মা প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যার জাগতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। (আল্ মওউদ, আনোয়ারুল উলুম, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ৫২৯-৫৩০)

মুসলেহ্ মওউদ কে?

অতএব, এ হল সেই ইলহামের সারমর্ম। কীভাবে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর ব্যক্তিসত্তায় এগুলো প্রকাশ পেয়েছে, তার বিস্তারিত বিবরণে এখন আমি যাব না, তবে পরবর্তীতে আমি কিছুটা তুলে ধরব।

অতঃপর এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, অনেকেই আপত্তি করে আর সে যুগেও **এ আপত্তি ছিল যে, আপনি মুসলেহ্ মওউদ নন** বরং পরবর্তীতে তিন-চারশ' বছর অথবা একশ' বা দু'শ বছর পর কোন এক সময় মুসলেহ্ মওউদ জন্মগ্রহণ করবেন। তিনি (রা.) বলেন– অনেকে বলে, মুসলেহ্ মওউদ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বংশধরদের পরবর্তী কোন প্রজন্মে তিন-চারশ' বছর পর জন্ম গ্রহণ করবে, বর্তমান যুগে তাঁর আগমন হতে পারে না। কিন্তু তাদের কেউ কী খোদা তা'লাকে ভয় করে না? কমপক্ষে ভবিষ্যদ্বাণীর বাক্যগুলো দেখা উচিত, সেগুলো নিয়ে ভাবা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেন, ইসলামের বিরুদ্ধে এখন আপত্তি করা হয় যে, ইসলাম নিজের মাঝে নিদর্শন প্রদর্শনের কোন বৈশিষ্ট্য রাখে না। যেমন পণ্ডিত লেখরাম আপত্তি করছিল, ইসলাম যদি সত্য ধর্ম হয়ে থাকে তাহলে নিদর্শন দেখানো উচিত। ইন্দ্র মোহনও আপত্তি করছিল যে, ইসলাম সত্য ধর্ম হয়ে থাকলে নিদর্শন দেখানো হোক। তিনি (আ.) তখন খোদা তা'লার দরবারে সেজদাবনত হয়ে বলেন, হে খোদা! তুমি এমন নিদর্শন প্রদর্শন কর, যা এসব নিদর্শন কামীদেরকে ইসলামের মাহাত্ম্য স্বীকারে বাধ্য করে।

অতএব, এমন নিদর্শন প্রদর্শন করার কথা বলা হয়েছে যা ইন্দ্র মোহন মুরাদাবাদী প্রমুখকে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব মানতে বাধ্য করবে। এ সব আপত্তিকারী আমাদেরকে বলে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করেন তখন খোদা তা'লা নাকি তাঁকে সংবাদ দিয়ে বলেছেন, আজ থেকে তিনশ' বছর পর আমরা তোমাকে এমন এক পুত্রসন্তান দান করব, যে ইসলামের সত্যতার নিদর্শন হবে। জগতে কি এমন কোন ব্যক্তি আছে, যে এই কথাকে যুক্তিযুক্ত আখ্যা দেবে? এটি তো এমন কথা হল, যেভাবে কোন ব্যক্তি প্রচণ্ড পিপাসার্ত হয়ে কারো দ্বারে গিয়ে বলে, ভাই আমার খুবই তেষ্টা পেয়েছে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমাকে পানি পান করাও আর সে প্রত্যুত্তরে বলে, ভাই আপনি চিন্তা করবেন না, আমি আমেরিকায় চিঠি লিখেছি, সেখান থেকে এ বছরেরই শেষের দিকে উন্নতমানের (ফলের) নির্যাস আসবে আর পরের বছরই শরবত বানিয়ে আপনাকে পান করানো হবে। কোন বদ্ধ পাগলও এমন কথা বলতে পারে না। আর পুরোপুরি কোন উন্মাদও খোদা এবং তাঁর রসূলের প্রতি এমন কথা আরোপ করতে পারে না।

পণ্ডিত লেখরাম, মুন্সি ইন্দ্র মোহন মুরাদাবাদী এবং কাদিয়ানের হিন্দুরা বলছে, ইসলাম সম্পর্কে দাবি করা হয় যে, এর খোদা জগদ্বাসীকে নিদর্শন দেখানোর ক্ষমতা রাখেন, এটি একটি মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন দাবি। যদি এ দাবির কোন সত্যতা থেকে থাকে তবে আমাদেরকে নিদর্শন দেখানো হোক। তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার দরবারে সেজদাবনত হয়ে বলেন, হে খোদা! আমি তোমার সমীপে প্রার্থনা করছি, তুমি আমাকে তোমার রহমতের নিদর্শন দেখাও, তোমার শক্তিমত্তার এবং নৈকট্যের নিদর্শন দান কর। অতএব, উল্লিখিত সব নিদর্শন নিদর্শনপ্রার্থীর জীবদ্দশায় নিকটবর্তী কোন সময়েই প্রকাশিত হওয়া উচিত আর কার্যত হয়েছেও তাই। আল্লাহ্ তা'লার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ১৮৮৯ সনে যখন আমার জন্ম হয় তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে যারা নিদর্শন দেখতে চেয়েছিল তারা জীবিতই ছিল। আর আমার বয়স যত বাড়তে থাকে, আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনাবলীও ক্রমবর্ধিতহারে অবিরাম ধারায় প্রকাশ পেতে থাকে। (ম্যাঁয় হি মুসলেহ্ মওউদ কি পেশগোয়ী কা মিসদাক হুঁ, আনোয়ারুল উলুম, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ২২২-২২৩)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর একটি রুই'য়্যা বা সত্য স্বপ্ন

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর সত্তায় কীভাবে পূর্ণ হয়েছে, এ-সংক্রান্ত নিজের একটি রুই'য়্যা বা সত্য স্বপ্নের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে আমার দেখা স্বপ্নের যে অন্তমিল রয়েছে তা আমি বর্ণনা করছি। [যেমনটি আমি বলেছি, তিনি (রা.) একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। এবং বলেন,] আমি স্বপ্নে দেখি, আমার মুখ থেকে–

أَنَا الْمَسِيْحُ الْمَوْعُوْدُ مِثْلُهُ وَخَلِيْفَتُهُ

(উচ্চারণ: **আনাল মসীহুল মাওউদু মাসীলুহু ওয়া খলীফাতুহু**) বাক্য নিঃসৃত হচ্ছে। এই শব্দগুলো আমার মুখ থেকে নিঃসৃত হওয়া আমার জন্য এতটাই বিস্ময়কর ছিল (বাহ্যিকভাবে তো এরূপ বিস্ময় হতেই পারে কিন্তু স্বপ্নেও আমার এমন অবস্থা হয়) যে, আতঙ্কে আমার জেগে ওঠার উপক্রম হয়, অর্থাৎ (বিস্মিত হই যে) এ কেমন কথা আমার মুখ থেকে বের হল! পরবর্তীতে কোন কোন বন্ধু মনোযোগ আকর্ষণ করেন যে, মসীহি নফ্‌স্ হওয়ার উল্লেখ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৬ সনের প্রচারপত্রেও রয়েছে। সেই দিন যদিও আমি এই প্রচারপত্র পড়ে এসেছিলাম, কিন্তু আমি যখন খুতবা পাঠ করছিলাম তখন প্রচারপত্রের এই শব্দগুচ্ছ আমার স্মরণ ছিল না। খুতবার পর সম্ভবত দ্বিতীয় দিন মৌলভী সৈয়্যদ সরোয়ার শাহ্ সাহেব আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রচারপত্রেও এ লেখা আছে, 'সে পৃথিবীতে আসবে এবং নিজের মসীহি-সত্তা ও পবিত্র আত্মার প্রসাদে বহুজনকে ব্যাধিমুক্ত করবে'।

এই ভবিষ্যদ্বাণীতেও 'মসীহ্' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ আমি স্বপ্নে দেখি, আমি প্রতিমা বা মূর্তি ভাঙছি। এর ইঙ্গিতও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বিতীয় অংশে পাওয়া যায় যে, সে 'রূহুল হক' বা পবিত্র আত্মার কল্যাণে বহু মানুষকে ব্যাধিমুক্ত করবে। তিনি (রা.) বলেন, 'রূহুল হক' মূলতঃ তৌহীদের প্রাণকে বলা হয়। আর সত্যি কথা হল, খোদা তা'লার সত্তাই হল আসল আর বাকি সবকিছুই ছায়া ও প্রতিবিম্ব। অতএব, রূহুল হক অর্থ হচ্ছে তৌহীদের প্রাণ, যার সম্পর্কে এটি বলা হয়েছিল যে, 'সে এর কল্যাণে অনেক মানুষকে ব্যাধিমুক্ত করবে'। তৃতীয়তঃ আমি (স্বপ্নে) এটিও দেখেছি যে, আমি দৌড়াচ্ছি। অতএব, খুতবাতে আমি একথাও উল্লেখ করেছিলাম যে স্বপ্নে আমি শুধু এটিই দেখি নি যে, আমি দ্রুত হাঁটছি বরং আমি দৌড়াচ্ছি আর আমার পদতলে ভূমি সঙ্কুচিত হয়ে চলছে। প্রতিশ্রুত সন্তান-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতেও এই শব্দগুলো রয়েছে যে, সে দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। একইভাবে আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি ভিন্ন কতিপয় দেশে গিয়েছি, আর সেখানেও আমি নিজের কর্মকাণ্ড শেষ করি নি বরং আমি আরো সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার সংকল্প করছি। আমি যেন বলছি, 'হে আব্দুশ্ শাকূর! এখন আমি সম্মুখে এগিয়ে যাব আর যখন এ সফর থেকে ফিরে আসব তখন দেখব এই সময়ের মধ্যে তুমি তৌহীদকে প্রতিষ্ঠিত করেছ, শির্ককে নির্মূল করেছ এবং ইসলাম ও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষাকে মানুষের হৃদয়ে প্রোথিত করে দিয়েছ'। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি যে বাণী আল্লাহ্ তা'লা অবতীর্ণ করেছেন, তাতেও এদিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন লেখা আছে, 'সে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে সুখ্যাতি লাভ করবে'। এই শব্দগুচ্ছও তার দূরদূরান্তে গমন এবং অগ্রসর হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

এরপর এ ভবিষ্যদ্বাণীতে এটিও উল্লেখ রয়েছে যে, **তাকে জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে।** আমার স্বপ্নে এর প্রতিও ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। যেমন- স্বপ্নে আমি অতি উচ্চস্বরে বলছি, 'আমি সেই ব্যক্তি যাকে ইসলাম ধর্মের জ্ঞান ও আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি এবং এর অন্তর্নিহিত তত্ত্বজ্ঞান মায়ের কোলে থাকা অবস্থায় মাতৃদুগ্ধের সাথে পান করানো হয়েছে'। এরপর লেখা আছে, 'সে ঐশী প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে'। স্বপ্নে এর প্রতিও স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমনটি আমি বলেছি, স্বপ্নে আমার মুখ (অন্য কারো) নিয়ন্ত্রণাধীনে অর্থাৎ আমার মুখ দিয়ে খোদা তা'লা কথা বলতে আরম্ভ করেছেন। এরপর মহানবী (সা.) আসেন এবং তিনিও আমার মুখে কথা বলেন। তারপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আসেন এবং একইভাবে আমার মুখে কথা বলতে আরম্ভ করেন। এটি ছিল ঐশী প্রতাপের এক বিস্ময়কর প্রকাশ, যার উল্লেখ ভবিষ্যদ্বাণীতেও পাওয়া যায়। অতএব, উভয়ের মাঝে এটিও বিদ্যমান একটি সামঞ্জস্য।

এরপর লেখা আছে, **সে মহিমান্বিত এবং মাহাত্ম্য ও সম্পদের অধিকারী হবে।** এগুলো ভবিষ্যদ্বাণীর বাক্য আর স্বপ্নেও এগুলো দেখানো হয়েছে যে, একটি জাতিতে আমি এক ব্যক্তিকে নেতা মনোনীত করি আর যেভাবে এক শক্তিশালী বাদশাহ্ তার অধীনস্থকে আদেশ দেয়, অনুরূপভাবে আমিও বলি, 'হে আব্দুশ্ শাকূর! তোমার দেশ যেন স্বল্পতম সময়ের মধ্যে তৌহিদের প্রতি ঈমান আনে, শির্ক পরিত্যাগ করে, মহানবী (সা.)-এর শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নির্দেশাবলীকে নিজেদের দৃষ্টিতে রাখে– এগুলো হল আমার পক্ষ থেকে তোমার উপর অর্পিত দায়িত্ব'। এটি মহা মহিমান্বিত এবং মহান সত্তারই উক্তি হতে পারে যা স্বপ্নে আমার মুখে জারি করা হয়েছে। আর ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত, **'আমরা তার মাঝে আমাদের রূহ ফুৎকার করব'**– এ কথাটি এর প্রতি ইঙ্গিত করে যে, তার প্রতি ঐশী বাণী অবতীর্ণ হবে আর স্বপ্নে এরও উল্লেখ রয়েছে। অতএব, ঐশী ইচ্ছার অধীনে স্বপ্নে আমার এ উপলব্ধি হয় যে, এখন কথা আমি বলছি না বরং খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ইলহামী ভাষায় আমাকে কথা বলানো হচ্ছে। তাই স্বপ্নের এ অংশে ভবিষ্যদ্বাণীর এ কথাগুলোর পূর্ণতার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 'আমরা তার মাঝে আমাদের রূহ ফুৎকার করব'।

এরপর, স্বপ্নের এ অংশও ভবিষ্যদ্বাণীর সেই শব্দগুলোর সত্যায়ন করে। অর্থাৎ স্বপ্নে আমার উপলব্ধি হয়, প্রতিটি পদক্ষেপ যা আমি নিচ্ছি তা পূর্ববর্তী কোন ওহী অনুযায়ী নিচ্ছি। এখন আমি মনে করি, আগামীতে যে সফরই আমি করব তা পূর্ববর্তী কোন ওহী-সম্মতই হবে। এর মাধ্যমে মুসলেহ্ মওউদ-সংক্রান্ত

ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর আমার জীবন এ ভবিষ্যদ্বাণীরই প্রতিফলিত চিত্র এবং ঐশী নিয়ন্ত্রণের অধীনস্ত। সে ভবিষ্যদ্বাণীটি কার সম্পর্কে, এ মর্মে পূর্ববর্তী ভবিষ্যদ্বাণীতে যে অস্পষ্টতা রাখা হয়েছিল, আমি মনে করি, এর অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা হল, মুসলেহ্ মওউদ-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার ফলে কোথাও সেই মানবীয় জ্ঞানের প্রভাব স্বপ্নের উপর পড়ে না যায়, যা ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে পূর্বেই আমার আত্মস্থ ছিল। স্বপ্ন এবং ইলহামে এ ধরনের পরিকল্পনা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সর্বদা অবলম্বন করা হয় আর ঐশী রহস্যাবলীর মাঝে এটিও একটি রহস্য। এগুলো হল সেই সাদৃশ্য, যা আমার স্বপ্ন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর মাঝে দেখতে পাওয়া যায়। (খুতবাতে মাহমুদ, ২৫তম খণ্ড, পৃ. ৬৯-৭১, জুমুআর খুতবা, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪ইং)

সাহাবীদের (রা.) একটি বড় অংশ এবং তাবেঈনদেরও একটি বড় অংশের উপস্থিতিতে ১৯৩৬ সনে শূরার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এখন ১৯৩৬ সন, [এটি অনেক পূর্বের কথা অর্থাৎ যখন তিনি (রা.) মুসলেহ্ মওউদ-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মুসলেহ্ মওউদ হওয়ার দাবি করেন, এটি তারও প্রায় আট বছর পূর্বেকার কথা] এখন আমাদের জামা'তের জন্য শুধু খিলাফতের প্রশ্নই নয়, বরং আরো দু'টি প্রশ্ন রয়েছে। একটি হল, নবুয়্যতের নিকটবর্তী যুগের প্রশ্ন এবং দ্বিতীয়টি হল, প্রতিশ্রুত খিলাফতের প্রশ্ন। এ দু'টি বিষয়ই এমন, যা প্রত্যেক খলীফার অনুসারীরা লাভ করতে পারে না। পূর্বেও একবার সম্ভবত গত বছরের কোন খুতবায় সংক্ষিপ্তভাবে আমি এর উল্লেখ করেছিলাম। তিনি (রা.) বলেন, আজ থেকে একশ' বা দু'শ বছর পরে বয়আত গ্রহণকারীদের ভাগ্যে এসব বিষয় জুটবে না। সেই যুগের সাধারণ মানুষ তো বটেই বরং খলীফারাও আমাদের কথা, কর্ম এবং নির্দেশনা হতে দিক-নির্দেশনা লাভের মুখাপেক্ষী থাকবেন। আর আমাদের কথা তো পরে আসবে, তারা বরং আপনাদের কথা, আমল এবং নির্দেশনা থেকে হিদায়াত লাভের মুখাপেক্ষী থাকবে। (সেই সময়ে যেসব সাহাবী উপস্থিত ছিলেন, তাদেরকে ইঙ্গিত করে এ কথা বলা হচ্ছে।) তিনি (রা.) বলেন, তারা খলীফা হবেন কিন্তু তারা বলবেন, অমুক খিলাফতের যুগে যায়েদ এ কথা বলেছিল এবং এমন কাজ করেছিল, তাই আমাদেরও তদ্রূপ করা উচিত।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর খিলাফত একটি প্রতিশ্রুত খিলাফত

অতএব, এটি শুধু খিলাফত এবং ব্যবস্থাপনারই প্রশ্ন নয় বরং ধর্মেরও প্রশ্ন। এরপর শুধু খিলাফতেরই প্রশ্ন নয় বরং এমন খিলাফতের প্রশ্ন যা প্রতিশ্রুত খিলাফত। ইলহাম ও ওহীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত খিলাফতের প্রশ্ন। খিলাফতের একটি ধরণ হল, খোদা তা'লা মানুষের মাধ্যমে খলীফা নির্বাচন করান এবং এরপর তাঁকে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা দেন। কিন্তু এটি সেরূপ খিলাফত নয়। তিনি (রা.) নিজের খিলাফত সম্পর্কে বলেন, এটি সেরূপ খিলাফত নয়। অর্থাৎ- আমি শুধু এজন্য খলীফা নই যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর মৃত্যুর পরের দিন আহমদীয়া জামা'তের সদস্যরা সমবেত হয়ে আমার খিলাফতের বিষয়ে একমত হয়েছে। বরং আমি এ কারণেও খলীফা যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের খিলাফতেরও পূর্বে খোদা তা'লার ইলহামের আলোকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছিলেন, আমি খলীফা হব। অতএব, আমি শুধুমাত্র খলীফা নই বরং 'প্রতিশ্রুত খলীফা'। আমি মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্ট নই, কিন্তু আমার কণ্ঠ খোদা তা'লার কণ্ঠ। কেননা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে খোদা তা'লা এর সংবাদ দিয়েছিলেন। বস্তুত এই খিলাফতের মাকাম বা মর্যাদা মা'মুরিয়াত এবং খিলাফতের মধ্যবর্তী কোন মাকাম বা মর্যাদা। এটি এমন বিষয় নয় যে, আহমদীয়া জামা'ত একে বৃথা যেতে দিবে আর খোদা তা'লার দৃষ্টিতে সফল বিবেচিত হবে। যেভাবে একথা সঠিক যে, নবী প্রতিদিন আসেন না, তদ্রূপ একথাও সঠিক যে, প্রতিশ্রুত খলীফাও প্রতিদিন আসেন না। তাছাড়া খোদা তা'লার নবী পঁচিশ-ত্রিশ বছর পূর্বে অমুক কথা আমাদেরকে এভাবে বলেছেন– একথা বলার সুযোগও প্রতিদিন পাওয়া যায় না। আধ্যাত্মিকতা এবং নৈকট্যের চেতনা সেই ব্যক্তির হৃদয়ে সৃষ্টি হতে পারে, যে একথা বলার সুযোগ পায় যে, আজ থেকে ত্রিশ বছর পূর্বে খোদা তা'লার প্রত্যাদিষ্ট এবং প্রেরিত ব্যক্তি এটি বলেছিল, সেই ব্যক্তির হৃদয়ে তা কীভাবে সৃষ্টি হতে পারে, যে কেবল এটি বলার সুযোগ পায় যে, আজ থেকে দু'শ বছর পূর্বে খোদা তা'লার প্রেরিত ব্যক্তি অমুক কথা এভাবে বলেছিলেন? কেননা দু'শ বছর পর যে বলবে, সে এর সত্যায়ন করতে পারবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি বিশ-ত্রিশ বছর পরে এ কথা বলবে, সে এর সত্যায়ন করতে পারে। (খুতবাতে শূরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮-১৯)

মুসলেহ্ মওউদ হওয়ার দাবি আগে কেন করেন নি

তিনি (রা.) বলেন, এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ যুগের লোকদের কথাবার্তা থেকে ভবিষ্যতের খলীফারা শিক্ষা গ্রহণ করবেন এবং তা বর্ণনা করবেন। এরপর মানুষের একথা বলা যে, আপনি যদি মুসলেহ্ মওউদ হয়ে থাকেন তবে একথার ঘোষণা দিচ্ছেন না কেন? অথচ তিনি (রা.) ১৯৪৪ সনে স্বয়ং এ ঘোষণা করেছিলেন। যাহোক, এর উত্তরে তিনি (রা.) বলেন, মানুষ এ চেষ্টাও করেছে যে, আমি যেন মুসলেহ্ মওউদ হওয়ার দাবি করি। কিন্তু আমি কখনো এর প্রয়োজন অনুভব করি নি। বিরুদ্ধবাদীরা বলে, আপনার অনুসারীরা আপনাকে মুসলেহ্ মওউদ বলে, কিন্তু আপনি নিজে কখনো এর দাবি

করেন না। কিন্তু আমি বলি, আমার দাবি করার কী প্রয়োজন? আমি যদি মুসলেহ্ মওউদ হয়ে থাকি তবে আমার দাবি না করাতে আমার মর্যাদায় কোন তারতম্য ঘটতে পারে না। আমার বিশ্বাস হল, যে ভবিষ্যদ্বাণী এমন এক ব্যক্তির জন্য করা হয়, যে কিনা মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্ট নয়, তার দাবি করা আবশ্যক নয়। তিনি (রা.) বলেন, আমার বিশ্বাস হল, যে ব্যক্তি মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্ট নয় তার জন্য কৃত ভবিষ্যদ্বাণীর অনুকূলে দাবি করা আবশ্যক নয়, আর মুজাদ্দিদগণও প্রত্যাদিষ্ট নন। তাই এমন দাবি করার আমার কী প্রয়োজন? রেলগাড়ি সম্পর্কে মহানবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। প্রশ্ন হল, এখন কি রেলগাড়ির জন্য দাবি করা আবশ্যক? অনুরূপভাবে দাজ্জাল-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, কিন্তু দাজ্জালের দাবি করা কি আবশ্যক? তবে হ্যাঁ, মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্টের জন্য ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে দাবির প্রয়োজন রয়েছে।

কিন্তু যিনি মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্ট নন, তিনি যদি না-ও জানেন যে, ভবিষ্যদ্বাণী তার সত্তায় পূর্ণতা লাভ করেছে তবুও এতে কোন ক্ষতি নেই। উম্মতে মুসলেমাহ্‌র মুজাদ্দিদগণের যে তালিকা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখানোর পর ছাপা হয়েছে, তাদের মাঝে কতজন আছেন যারা দাবি করেছিলেন? আমি স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলতে শুনেছি যে, আমার কাছে তো আওরঙ্গযেবকেও তার যুগের মুজাদ্দিদ মনে হয়। কিন্তু তিনি কি কোন দাবি করেছেন? উমর বিন আব্দুল আযীযকে মুজাদ্দিদ বলা হয়। তাঁর কোন দাবি আছে কি? অতএব, যারা প্রত্যাদিষ্ট নয়, তাদের জন্য দাবি করা আবশ্যক নয়। কেবল মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্টদের সত্যতার জন্য কৃত ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে দাবি করা আবশ্যক হয়ে থাকে। যারা প্রত্যাদিষ্ট নন, তাদের কাজের প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত। যদি কাজ সম্পূর্ণ হতে দেখা যায় তবে দাবির কী প্রয়োজন? এরূপ ক্ষেত্রে সে যদি অস্বীকারও করতে থাকে তবুও আমরা বলব, তার মাধ্যমেই এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। যদি উমর বিন আব্দুল আযীয মুজাদ্দিদ হওয়ার কথা অস্বীকারও করতেন তবুও আমরা বলতে পারতাম, তিনিই তার যুগের মুজাদ্দিদ।

কেননা মুজাদ্দিদের জন্য দাবি করার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কেবলমাত্র সেসব মুজাদ্দিদের জন্যই দাবি করা আবশ্যক, যারা প্রত্যাদিষ্ট। তবে হ্যাঁ, মা'মুর নয় এমন ব্যক্তি যদি নিজের যুগে পতনোন্মুখ ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করেন আর তিনি যদি নাও বুঝতে পারেন তবুও আমরা বলতে পারি, তিনি মুজাদ্দিদ। [ইসলামে মুজাদ্দিদ-এর কাজ কী? তার কাজ হল, ইসলামের পতনোন্মুখ ঈমান ও শিক্ষাকে দাঁড় করানো, ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুর আক্রমণকে প্রতিহত করা। আর যিনি এই কাজ করেন তিনিই মুজাদ্দিদ। তিনি (রা.) বলেন,] হ্যাঁ, প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ সে-ই হতে পারে, যে দাবি করে। যেমন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) করেছিলেন। অতএব, আমার পক্ষ থেকে মুসলেহ্ মওউদ হওয়ার দাবি করার কোন প্রয়োজন নেই আর বিরোধীদের এমন কথায় বিচলিত হওয়ারও কোন আবশ্যকতা নেই। এতে অমর্যাদার কোন বিষয় নেই। আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত সম্মানই প্রকৃত সম্মান, জগদ্বাসীর দৃষ্টিতে মানুষ লাঞ্ছিত হলেও তারা যদি খোদা তা'লাকে মান্য করে চলে তবে তারা অবশ্যই সম্মানিত হবে। আর কোন ব্যক্তি যদি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজের ভ্রান্ত দাবিকে সত্য বলে প্রমাণিত করার চেষ্টা করে আর নিজের ধূর্ততা ও প্রতারণার মাধ্যমে মানুষের মাঝে বিজয়ও অর্জন করে নেয়, তবুও খোদার দরবারে সে সম্মান লাভ করতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি খোদার দরবারে সম্মানিত নয়, বাহ্যিকভাবে তাকে যতই সম্মানিত মনে করা হোক না কেন সে কিছু হারিয়েছে বৈ কিছু অর্জন করে নি। অবশেষে একদিন সে নির্ঘাত লাঞ্ছিত হবে। (খুতবাতে মাহমুদ, ২১তম খণ্ড, পৃ. ৫৯-৬০)

এরপর ১৯৪৪ সনে তিনি (রা.) যখন দাবি করেন এবং মুসলেহ্ মওউদ হওয়ার ঘোষণা দেন তখন তিনি বলেন, আমাদের জামা'তের বন্ধুরা এই ভবিষ্যদ্বাণী এবং এ ধরণের অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণী আমার সামনে বার বার উপস্থাপন করে থাকেন আর জোর দিয়ে বলেন, সেগুলো আমার ক্ষেত্রে পূর্ণ হয়েছে– এ মর্মে আমি যেন ঘোষণা দেই (যেমনটি পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে)। কিন্তু আমি তাদেরকে সর্বদা একথাই বলে এসেছি যে, ভবিষ্যদ্বাণী স্বয়ং তার সত্যায়নকারীকে প্রকাশ করে। এসব ভবিষ্যদ্বাণী যদি আমার সম্পর্কে হয়ে থাকে তবে যুগই সাক্ষ্য দিবে যে, এসব ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নস্থল আমি। আর যদি তা আমার সম্পর্কে না হয়ে থাকে তবে যুগের সাক্ষ্য আমার বিপরীতে যাবে। উভয় ক্ষেত্রেই আমার বলার কিছু নেই।

এসব ভবিষ্যদ্বাণী যদি আমার সম্পর্কে না হয় তবে আমি একথা বলে কেন গুনাহ্‌গার হতে যাব যে, এগুলো আমার সম্পর্কে করা হয়েছে। আর সত্যিই যদি এগুলো আমার সম্পর্কে করা হয়ে থাকে তবে আমার ত্বরাপরায়ণ হওয়ার প্রয়োজন কী? সময় নিজেই তা প্রকাশ করে দিবে। মোটকথা, ঐশী ইলহামে যেমনটি বলা হয়েছিল, তারা বলে আগমনকারী ব্যক্তি কি ইনিই, নাকি আমরা অন্য কারো অপেক্ষায় পথ চেয়ে থাকব? পৃথিবীর মানুষ এতবার এ প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করেছে যে, প্রশ্ন করতে করতে এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করে দিয়েছে। এই দীর্ঘ সময় সম্পর্কেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন ইলহামে সংবাদ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, হযরত ইয়াকূব (আ.) সম্পর্কে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইগণ বলেছিলো, ইউসুফের কথা বলতে বলতে তুমি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হবে অথবা তুমি মরেই যাবে। আর একই ইলহাম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতিও হয়েছে।

একইভাবে এ ইলহাম হওয়া যে, আমি

ইউসুফের সৌরভ পাচ্ছি– এতে একথার প্রতিই ইঙ্গিত ছিল যে, খোদা তা'লার ইচ্ছার অধীনে এ বিষয়টি দীর্ঘদিন পরে প্রকাশ পাবে। এখনো আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এসব ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে মৃত্যুর নিকটবর্তী সময় পর্যন্তও যদি আমাকে এই জ্ঞান দেয়া না হত যে, এগুলো আমার সম্পর্কে, বরং যদি মৃত্যু পর্যন্তও আমাকে এই জ্ঞান দেয়া না হত, তবুও এতে কোন সমস্যা ছিল না। ঘটনাক্রম নিজেই প্রকাশ করত যে, এসব ভবিষ্যদ্বাণী যেহেতু আমার যুগে এবং আমার হাতে পূর্ণ হয়েছে তাই এর পরিপূরণস্থল আমিই। সমর্থনসূচক কোন কাশ্‌ফ বা ইলহাম হওয়া একটি অতিরিক্ত বিষয়। কিন্তু খোদা তা'লা নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী এ বিষয়টি যেহেতু প্রকাশ করে দেন আর আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে জ্ঞানও দান করেন যে, মুসলেহ্ মওউদ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ আমার জন্য করা হয়েছে, তাই আজ প্রথমবার আমি সেসব ভবিষ্যদ্বাণী আনিয়ে এই মানসে দেখেছি যেন এসব ভবিষ্যদ্বাণীর যথার্থতা বুঝতে পারি আর খতিয়ে দেখতে পারি যে, আল্লাহ্ তা'লা এতে কী কী কথা বর্ণনা করেছেন। আমাদের জামা'তের বন্ধুরা যেহেতু সেসব ভবিষ্যদ্বাণী আমার প্রতি আরোপ করত তাই আমি সর্বদা এসব ভবিষ্যদ্বাণী মনোযোগ দিয়ে পড়া থেকে বিরত থাকতাম এবং আশঙ্কা হতো, পাছে কোন ভুল ধারণা যেন আমার মন ও মস্তিষ্কে জন্ম না নেয়। কিন্তু আজ প্রথমবার আমি সেসব ভবিষ্যদ্বাণী পড়ি আর এসব ভবিষ্যদ্বাণী পড়ার পর আমি খোদা তা'লার কৃপায় দৃঢ় বিশ্বাস এবং নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারি, খোদা তা'লা এসব ভবিষ্যদ্বাণী আমার মাধ্যমেই পূর্ণ করেছেন। (খুতবাতে মাহমুদ, ২৫তম খণ্ড, পৃ. ৫৯-৬১)

এমন হয়েছে যে, যখন তিনি (রা.) বলেছিলেন, আমার কোন প্রকার ঘোষণা দেয়ার প্রয়োজন নেই। এরপর সেই সময়ও এসেছে যখন আল্লাহ্ তা'লা তাঁর কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তুমিই মুসলেহ্ মওউদ তাই ঘোষণা দাও। আপত্তিকারী এবং অমান্যকারীদের তিনি সুস্পষ্টভাবে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। তিনি (রা.) বলেন, আমি বলছি এবং খোদা তা'লার কসম খেয়ে বলছি, আমার সত্তাতেই মুসলেহ্ মওউদ-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লা আমাকেই সেসব ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূরণস্থল বানিয়েছেন, যা এক প্রতিশ্রুত পুত্রের আগমন সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) করেছিলেন। যে ব্যক্তি মনে করে আমি মিথ্যা রচনা করছি বা এ সম্পর্কে মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছি, সে আসুক এবং এ বিষয়ে আমার সাথে মুবাহালা করুক অথবা আল্লাহ্ তা'লার শাস্তি কামনা করে কসম খেয়ে সে ঘোষণা করুক যে, খোদা তা'লা তাকে জানিয়েছেন, আমি মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছি। এরপর আল্লাহ্ তা'লা নিজেই তাঁর ঐশী নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে বিষয়টির মিমাংসা করে দিবেন যে, কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী। (আল্ মওউদ, আনোয়ারুল উলুম, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ৬৪৫)

মুসলেহ্ মওউদ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর কিয়দংশের ব্যাখ্যা

এরপর আমি ভবিষ্যদ্বাণীর বিভিন্ন অংশের ব্যাখ্যা করছি। যেমন ভবিষ্যদ্বাণীর একটি অংশ ছিল, **'তাকে বাহ্যিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে'**। বাহ্যিক জ্ঞানের বিষয়ে একটি দিক হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নিয়েছেন। একস্থানে তিনি বলেন, এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকৃত মর্ম হল, সে নিজে বাহ্যিক জ্ঞান অর্জন করবে না, বরং খোদা তা'লার পক্ষ থেকে তাকে এই জ্ঞান শিখানো হবে। স্মরণ রাখা উচিত, এখানে একথা বলা হয় নি যে, তিনি বাহ্যিক জ্ঞানে পারদর্শী হবেন বরং বাক্যটি হচ্ছে, তাকে বাহ্যিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে। যার অর্থ হচ্ছে, অন্য কোন শক্তি তাকে এই বাহ্যিক জ্ঞান শিখাবে। তার নিজের ব্যক্তিগত চেষ্টা, অধ্যবসায় এবং প্রচেষ্টার কোন ভূমিকা এতে থাকবে না।

এখানে বাহ্যিক জ্ঞানের অর্থ গণিত, বিজ্ঞান, ইত্যাদির শাস্ত্রীয় জ্ঞান হতে পারে না। কেননা এখানে 'পূর্ণ করা হবে' শব্দ রয়েছে, যা থেকে বুঝা যায়, খোদা তা'লার পক্ষ থেকে তাকে এই জ্ঞান শেখানো হবে আর খোদার পক্ষ থেকে বিজ্ঞান, গণিত কিংবা ভূগোলের জ্ঞান শেখানো হয় না, বরং ধর্ম ও কুরআন শেখানো হয়। অতএব, ভবিষ্যদ্বাণীর এই অংশ, 'তাকে বাহ্যিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে'– এর অর্থ হল, তাকে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ধর্মীয় জ্ঞান এবং কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান শেখানো হবে এবং খোদা তা'লা স্বয়ং তার শিক্ষক হবেন। তিনি (রা.) বলেন, আমার শিক্ষা যেভাবে হয়েছে তা স্পষ্টই প্রকাশ করে যে, আমার শিক্ষা লাভ করার ক্ষেত্রে মানবীয় কোন হাত ছিল না। আমার শিক্ষকদের মধ্য হতে কতক বেঁচে আছেন, আবার কতক মারাও গেছেন। আমার শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে আমার প্রতি সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর। (আল্ মওউদ, আনোয়ারুল উলুম, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ৫৬৫-৫৬৬)

এরপর তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় **ফিরিশ্‌তাদের মাধ্যমে আমাকে পবিত্র কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন** এবং আমার মাঝে তিনি এমন যোগ্যতা সৃষ্টি করেছেন যে, কেউ যেভাবে কোন ধনভাণ্ডারের চাবি পেয়ে যায়, ঠিক একইভাবে আমি পবিত্র কুরআনের জ্ঞানভাণ্ডারের চাবি লাভ করেছি। পৃথিবীতে এমন কোন আলেম নেই, যে আমার মোকাবিলায় আসবে আর আমি তার কাছে পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারব না।

তিনি (রা.) লাহোরে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, এটি লাহোর শহর। এখানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, বিভিন্ন কলেজও খোলা হয়েছে। শাস্ত্রীয় জ্ঞানের বড় বড় পণ্ডিতবর্গ এখানে রয়েছেন। আমি তাদের সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলছি, পৃথিবীর যেকোন জ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তি

আমার সামনে আসুক, যেকোন অধ্যাপক বা বিজ্ঞানী আমার সামনে এসে দাঁড়াক এবং সে তার জ্ঞানের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের উপর আক্রমণ করে দেখুক, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমি তাকে এমন দাঁতভাঙা জবাব দিতে পারি যে, পৃথিবীর মানুষ স্বীকার করতে বাধ্য হবে, তার উত্থাপিত আপত্তির খণ্ডন করা হয়েছে। আর আমি দাবির সাথে বলছি, আমি খোদা তা'লার কালাম বা কুরআন হতেই তার উত্তর দিব এবং পবিত্র কুরআনের আয়াতের আলোকেই তার আপত্তি খণ্ডন করে দেখাব। (ম্যায় হি মুসলেহ্ মওউদ কি পেশগোয়ি কা মিসদাক হুঁ, আনোয়ারুল উলুম, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ২২৭)

"আহমদীয়াতের পয়গাম" নামে একটি প্রবন্ধ তিনি (রা.) রচনা করেছিলেন, যাতে 'আহমদীয়াত কী'-মর্মে প্রশ্নকারীদের প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। এই প্রবন্ধের একস্থলে তিনি বলেন, **লেখক স্বয়ং ফিরিশ্‌তাদের নিকট থেকে অনেক কিছু শিখেছে।** একবার এক ফিরিশ্‌তা আমাকে সূরা ফাতিহার তফসীর শিখান আর তখন থেকে নিয়ে অদ্যাবধি সূরা ফাতিহার জ্ঞান এত ব্যাপকভাবে আমার নিকট উন্মোচিত হয়েছে যে, এর কোন সীমা নেই। আমি দাবির সাথে বলছি, অন্য যে কোন ধর্মের অনুসারী তার পুরো ধর্মগ্রন্থ হতে যে পরিমাণ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বর্ণনা করতে পারবে, খোদার অপার কৃপায় তার চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞান আমি শুধু সূরা ফাতিহা হতেই বর্ণনা করতে পারি। বহুদিন ধরে আমি বিশ্ববাসীকে এই চ্যালেঞ্জ দিয়ে আসছি কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নি। আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ, খোদার একত্ববাদের প্রমাণ, রিসালতের আবশ্যকতা, পরিপূর্ণ শরীয়তের লক্ষণাবলী ও মানবমণ্ডলীর জন্য এর প্রয়োজনীয়তা, দোয়া, তকদীর, হাশর-নশর, বেহেশ্‌ত, দোযখ, এসব বিষয়ের উপর সূরা ফাতিহায় এমনভাবে আলোকপাত করা রয়েছে যে, অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের শত শত পৃষ্ঠা পাঠ করলেও ততটা জানা সম্ভব নয়। (আহমদীয়াত কা পয়গাম, আনোয়ারুল উলুম, ২০তম খণ্ড, পৃ. ৫৬৭)

এরপর তিনি (রা.) বলেন, খিলাফতের পদে আসীন হওয়ার পর **আল্লাহ্ তা'লা কুরআনের জ্ঞান এত ব্যাপকভাবে আমার কাছে উন্মোচন করেছেন যে, এখন কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতে মুসলেমাহ্ আমার বইপুস্তক পাঠ করতে এবং তা থেকে উপকৃত হতে বাধ্য।** ইসলামী এমন কোন্ বিষয় আছে যা আল্লাহ্ তা'লা আমার মাধ্যমে সবিস্তারে উন্মোচন করেন নি? নবুয়্যত, কুফর, খিলাফত, তকদীর, কুরআনে নিহিত মানবজীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়াদির উদ্‌ঘাটন এবং ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী রাজনীতি ও ইসলামী সমাজব্যবস্থা, ইত্যাদি বিষয়ে এত বিস্তারিত কোন প্রবন্ধ গত তেরশ' বছর ধরে ছিল না। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ইসলামের এ সেবা করার তৌফিক দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ তা'লা আমার মাধ্যমেই এই বিষয় সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে অন্তর্নিহিত তত্ত্বজ্ঞানের দ্বার উন্মোচন করেছেন, যা আজ শত্রু-মিত্র সবাই নকল করছে। আমাকে কেউ লক্ষ বার গালি দিক বা গালমন্দ করুক, যে ব্যক্তিই বিশ্বে ইসলামের শিক্ষা প্রচার করতে চাইবে তাকে অবশ্যই আমার দ্বারস্থ হতে হবে। সে পয়গামী (লাহোরী জামা'তের সদস্য-অনুবাদক) হোক বা মিসরী (অর্থাৎ একটি ফেতনা সৃষ্টিকারী দল) হোক, আমার অনুগ্রহের গণ্ডির বাইরে তারা কোন ক্রমেই যেতে পারবে না। তাদের সন্তানসন্ততি যখনই ইসলামের সেবা করার ইচ্ছা করবে আমার বইপুস্তক পড়তে এবং কাজে লাগাতে বাধ্য হবে। বরং আমি গর্ব না করেই বলতে পারি, এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি তথ্য আমার মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে এবং হচ্ছে। অতএব, এরা আমাকে যাই বলুক না কেন, যত ইচ্ছা গালি দিক না কেন, তারা যদি কুরআনের জ্ঞান লাভ করতে চায়, তবে আমার মাধ্যমেই লাভ করতে পারবে এবং বিশ্ববাসী তাদেরকে একথা বলতে বাধ্য হবে, হে নির্বোধেরা! তোমাদের থলিতে যা কিছু আছে তা তো তোমরা তার কাছ থেকেই নিয়েছ। অতএব, কোন্ মুখে তার বিরোধিতা করছ? (খিলাফতে রাশেদা, আনোয়ারুল উলুম, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ৫৮৭-৫৮৮)

এরপর অপর এক খুতবায় তিনি (রা.) বলেন, আমাদের একজন শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষকের ঘটনাটি হল, তিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর দরসে উপস্থিত হতেন, কিন্তু তার অন্যান্য সহকর্মীদের দরসে তিনি যেতেন না। তিনি বলতেন, সেখানে আমি নতুন কিছু শুনতে পাই না। (খুতবাতে মাহমুদ, ২২তম খণ্ড, পৃ. ৪৭২)

যাহোক, এ হল সারসংক্ষেপ। এরপর এক জায়গায় তিনি (রা.) বলেন, "১৯০৭ সনে সর্বপ্রথম জনসমক্ষে আমি কোন বক্তৃতা করি। জলসার অধিবেশন চলছিল, অনেক মানুষ উপস্থিত ছিল, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি সূরা লোকমান এর দ্বিতীয় রুকু পাঠ করি এবং এর তফসীর বর্ণনা করি। আমার নিজের অবস্থা তখন এমন ছিল যে, বক্তৃতা দিতে যখন আমি দাঁড়াই, এর পূর্বে যেহেতু আমি কখনো জনতার উদ্দেশ্যে কোন বক্তৃতা করি নি আর আমার বয়সও তখন মাত্র আঠার বছর আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)ও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, আঞ্জুমানের সদস্যগণও ছিলেন এবং অন্যান্য বন্ধুরাও এসেছিলেন। তাই আমার চোখের সামনে তখন অন্ধকার নেমে আসে আর আমি বুঝতেই পারছিলাম না, আমার সামনে কে বসা আছে আর কে নেই। আধা ঘন্টা বা পৌনে এক ঘন্টা পর্যন্ত আমি বক্তৃতা দেই।

বক্তৃতা শেষ করে আমি যখন বসি, আমার স্মরণ আছে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) দাঁড়িয়ে বলেন, মিয়াঁ! আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, তুমি অনেক উচ্চমার্গের বক্তৃতা দিয়েছ। আমি তোমাকে খুশি করার জন্য বলছি না, আমি

তোমাকে নিশ্চিত করে বলছি, প্রচুর পড়াশুনার অভ্যাস আমার রয়েছে আর অনেক বড় বড় তফসীর-গ্রন্থও আমি পাঠ করেছি কিন্তু আমি আজ তোমার বক্তৃতায় পবিত্র কুরআনের সেসব অর্থ শুনেছি, যা পূর্ববর্তী কোন তফসীরে আমি পাই নি। এমনকি, এর পূর্বে আমি তা জানতামও না। এটি কেবল আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপাই ছিল নতুবা আসল কথা হচ্ছে তখন আমার অধ্যয়নও তত বেশি ছিল না আর পবিত্র কুরআনে গভীর অভিনিবেশে দীর্ঘ সময়ও অতিবাহিত হয় নি। এরপরও আল্লাহ্ তা'লা আমার মুখ থেকে এমন তত্ত্বপূর্ণ বাণী নিঃসৃত করেছেন যা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয় নি"। (খুতবাতে মাহমুদ, ২২তম খণ্ড, পৃ. ৪৭৩)

"তাকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ করা হবে"– এ সম্পর্কেও কিছু বলছি। প্রথমে বাহ্যিক জ্ঞান সম্পর্কে বলা হয়েছে, এখন আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা সম্পর্কে বলা হচ্ছে। এ সম্পর্কে তিনি (রা.) বলেন, আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্থ হল, সেই বিশেষ জ্ঞান, যা খোদা তা'লার সাথে বিশেষভাবে সম্পর্ক রাখে। যেমন– অদৃশ্যের জ্ঞান যা তিনি তাঁর এমন বান্দাদের কাছে প্রকাশ করেন, যাদেরকে তিনি পৃথিবীতে কোন বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত করেন, যাতে আল্লাহ্ তা'লার সাথে তাদের সম্পর্কের বিষয়টি প্রকাশ পায় এবং এর ফলে মানুষের ঈমান সতেজ হয়। অতএব, এ ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'লা আমাকে বিশেষ দানে ভূষিত করেছেন এবং অদৃশ্যের জ্ঞানভিত্তিক শত শত স্বপ্ন আমাকে দেখিয়েছেন এবং ইলহামও আমার প্রতি হয়েছে। তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশাতেই, খিলাফতের কোন ধারণাই যখন মাথায় আসা সম্ভব ছিল না, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আমার প্রতি ইলহাম হয়–

إِنَّ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ তোমার প্রতি ঈমান আনয়নকারীরা তোমার বিরুদ্ধবাদীদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত জয়যুক্ত থাকবে। এই ইলহাম আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে শোনালে তিনি তা লিখে রাখেন। এটি সেই আয়াত যা হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সেখানে শব্দগুলো এমন,

وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(সূরা আলে ইমরান: ৫৬)

অর্থ- আমি তোমার অস্বীকারকারীদের উপর তোমার অনুসারীদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত বিজয় দান করব। কিন্তু আমার প্রতি যে ইলহাম হয়েছে তা হল,

إِنَّ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

যা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি জোরালো এবং পূর্ণ। অর্থাৎ- আমি আমার সত্তার কসম করে বলছি, নিশ্চয় আমি তোমার অনুসারীদেরকে তোমার অস্বীকারকারীদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত বিজয় দান করব।

যেমনটি আমি বলেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এই ইলহাম শোনালে তিনি তা লিখে রাখেন। দীর্ঘদিন থেকেই বন্ধুদেরকে আমি এই ইলহামটি শুনিয়ে আসছি। দেখ! এর ফলে আমার বিরোধিতা কীভাবে হয়েছে অথচ আল্লাহ্ তা'লা আমাকেই বিজয় দান করেন। লাহোরী জামা'তের সদস্যরা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর যুগে এ কথা বলে অপপ্রচার করতো যে, একটি বাচ্চা ছেলের কারণে জামা'তকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু এ সবকিছুই সম্পূর্ণ বিফল প্রমাণিত হয়। এসব বিষয় সম্পর্কে আমি এতটাই অনবহিত ছিলাম যে, একদিন ফজরের নামাযের সময় আমি হযরত আম্মাজানের কক্ষে, যা একেবারেই মসজিদ সংলগ্ন, নামাযের অপেক্ষায় পায়চারী করছিলাম। তখন মসজিদ থেকে আমি মানুষের উচ্চস্বরে কথাবার্তা শুনতে পাই, যেন তারা কোন বিষয় নিয়ে বচসা করছে। এদের মধ্য থেকে একটি কণ্ঠ আমি চিনতে পারি, যা শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেবের কণ্ঠ ছিল। আমি শুনতে পাই, তিনি খুবই উত্তেজিত কণ্ঠে বলছেন, তাকওয়া অবলম্বন করা উচিত। খোদার ভয় নিজেদের হৃদয়ে ধারণ করা উচিত। এক বালককে সামনে এগিয়ে দিয়ে জামা'তকে ধ্বংস করা হচ্ছে। এক বালকের কারণে এসব বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই বিষয় সম্পর্কে তখন আমি এতটাই অনবহিত ছিলাম এবং তার একথা শুনে আমি আশ্চর্য হচ্ছিলাম যে, কে সেই বালক, যার সম্পর্কে একথা বলা হচ্ছে?

অতএব, আমি বাইরে বেরিয়ে আসি। আর খুব সম্ভব শেখ ইয়াকুব আলী সাহেবকে জিজ্ঞেস করি, মসজিদে আজ হইচই এর কারণ কী আর শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেব এসব কী বলছিলেন যে, এক বাচ্চা ছেলের কারণে এই নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হচ্ছে? সেই বাচ্চা ছেলেটি কে, যার প্রতি শেখ সাহেব ইঙ্গিত করছিলেন? তিনি হেসে বলেন, সেই বাচ্চা ছেলে তুমিই, অন্য আর কে হতে পারে? আমার ও তাদের দৃষ্টান্তটি এভাবে দেয়া যায়। বলা হয়, এক অন্ধ আর এক চক্ষুষ্মান উভয়ে একই পাত্রে খেতে বসেছে। অন্ধ মনে করে, আমি তো দেখতে পাই না আর সে চক্ষুষ্মান, সে তো সবকিছুই দেখছে। অবশ্যই সে আমার চেয়ে বেশি খাচ্ছে। এই কথা মনে হতেই সে দ্রুত খাবার খেতে আরম্ভ করে। এরপর তার ধারণা হয়, আমার এই কাজ সে দেখে থাকবে, তাই সেও হয়তো দ্রুত খাবার খেতে আরম্ভ করেছে, এখন আমি কী করব? সে তখন দু'হাতে খাবার খেতে আরম্ভ করে। এরপর সে ভাবে, এটিও সে দেখতে পাচ্ছে, তাই সেও হয়তো এখন দু'হাতে খাবার খেতে আরম্ভ করেছে। এখন আমি কীভাবে বেশি খেতে পারি? এ ধারণা হৃদয়ে জাগতেই সে এক হাতে খাবার খেতে থাকে আর অন্য হাত দিয়ে ভাত নিজের থলেতে পুরতে থাকে। এরপর সে ভাবে, আমার এই কাজও সে দেখে থাকবে, তাই সেও হয়তো এমনটি করা শুরু করেছে। এ কথা মনে পড়তেই সে

পুরো থালা (যা ছিল বড় এক গামলা) উঠিয়ে বলে এখন শুধু আমার অংশই রয়ে গেছে, তুমি তোমার অংশ নিয়ে নিয়েছ। অথচ দ্বিতীয় ব্যক্তির অবস্থা এমন ছিল যে, সে তখন পর্যন্ত এক লোকমাও খায় নি। এই অন্ধের কীর্তি দেখে সে এটা ভেবে মনে মনে হাসছিল যে, সে এটি কী করছে! [তিনি (রা.) বলেন], তাদের এবং আমার অবস্থা এমনই ছিল। তারা সেই অন্ধের মতো সব সময় ভাবে, সে এখন এমন করছে আর এভাবে জামা'তকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করছে অথচ আমি কিছুই জানতাম না যে, আমার বিরুদ্ধে কী কী হচ্ছে। খোদা তা'লার উপর ভরসা করা ছাড়া আমি আর কিছুই করতাম না আর অবস্থা সম্পর্কে এতটাই অনবহিত ছিলাম যে, ভাবছিলাম হয়তো অন্য কোন বাচ্চা ছেলের কথা বলা হচ্ছে, যার দিকে তারা ইঙ্গিত করছে। যদিও এরা অনেক প্রভাবশালী ছিল এবং জামা'তের উপর তাদের বিশেষ প্রভাবও ছিল, তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা তাদের সকল অপপ্রচার ব্যর্থ করে দেন এবং আমাকেই তিনি বিজয় এবং সফলতা দান করেন। (আল্ মওউদ, আনোয়ারুল উলুম, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ৫৭৯-৫৮১)

এরপর **"তিনকে চার করা"** সম্পর্কে তিনি (রা.) বলেন, এ কথাও সঠিক নয় যে, তিনকে চার করার লক্ষণ আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমি বিভিন্ন আঙ্গিকে তিনকে চার করেছি।

প্রথমতঃ এভাবে যে, আমার পূর্বে মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব, মির্যা ফযল আহমদ সাহেব এবং মির্যা বশীর আউয়াল জন্মগ্রহণ করেন আর চতুর্থ হলাম আমি। আর দ্বিতীয়তঃ আমার পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তিন জন পুত্রসন্তান জন্ম নিয়েছেন আর এভাবে আমি তাদের তিনকেও চার করেছি অর্থাৎ (কনিষ্ঠ থেকে জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে) মির্যা মুবারক আহমদ, মির্যা শরীফ আহমদ, মির্যা বশীর আহমদ আর চতুর্থ ছিলাম আমি। আর তৃতীয়তঃ এভাবেও আমি তিনকে চারে পরিণত করেছি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবিত সন্তানদের মধ্যে আমরা তিন ভাই, অর্থাৎ আমি, মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এবং মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনার কারণে তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব তাঁর আধ্যাত্মিক বংশধরের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর প্রতি তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর যুগে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন নি। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি স্বপ্ন থেকে বুঝা যেত, আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য হিদায়াত নির্ধারণ করে রেখেছেন। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর পর খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর যুগে তিনি আহমদীয়াতভুক্ত হন নি। যখন আমার যুগ আসে তখন আল্লাহ্ তা'লা এমন ব্যবস্থা করেন যে, তিনি আমার মাধ্যমে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন। এভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এক পুত্রকে আল্লাহ্ তা'লা অসাধারণ পরিস্থিতিতে আমার হাতে বয়আত করার তৌফিক দান করেন। অথচ তিনি ছিলেন আমার বড় ভাই আর বড় ভাইয়ের জন্য ছোট ভাইয়ের হাতে বয়আত করা খুবই কঠিন একটি বিষয় হয়ে থাকে।

যেমনটি বয়আতের পর তিনি স্বয়ং বলেছেন, আমি দীর্ঘদিন এ কারণে বয়আত করা থেকে বিরত ছিলাম যে, আমি যদি বয়আত করতাম তবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতেই করতাম অথবা খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর হাতে করতাম। কেননা তাঁদের উপর আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। আমার নিজের ছোট ভাইয়ের হাতে আমি কীভাবে বয়'আত করতে পারি? কিন্তু মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব বলেন, অবশেষে আমি (মনে মনে) বললাম, এই পেয়ালা আমাকে পান করতেই হবে। অতএব, তিনি আমার হাতে বয়আত করেন আর এভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে তিনকে চার-এ পরিণতকারী বানিয়েছেন। কেননা প্রথমে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বংশধরদের মধ্যে আমরা কেবল তিন ভাই-ই ছিলাম, এরপর তিন থেকে চার হয়ে যাই। [তিনি (রা.) বলেন,] এরপর এ দৃষ্টিকোণ থেকেও আমি তিনকে চার করেছি আমি ইলহামের চতুর্থ বছর জন্ম গ্রহণ করি। ১৮৮৬ সনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ ভবিষ্যদ্বাণীটি করেছিলেন আর ১৮৮৯ সনে আমার জন্ম হয় অর্থাৎ ১৮৮৬ এক, ১৮৮৭ দুই, ১৮৮৮ তিন এবং ১৮৮৯ চার। এর অর্থ, তিনকে চার করা-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে যেন এ সংবাদও দেয়া হয়েছিল যে, আমার জন্ম ভবিষ্যদ্বাণীর চতুর্থ বছরে হবে। আর এভাবেই আমি তিনকে চারে পরিণত করব আর এমনটিই হয়েছে এবং সে অনুসারেই আমার জন্ম হয়েছে। (আল্ মওউদ, আনোয়ারুল উলুম, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ৬৩৫-৬৩৭)

"ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে।" তিনি (রা.) বলেন, পঞ্চম সংবাদ যা দেয়া হয়েছিল তা হচ্ছে, তার আবির্ভাব ঐশী গৌরব এবং প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে। এটিও আমার যুগে পূর্ণ হয়েছে। অতএব, আমার খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হতেই প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ বাঁধে আর এখন দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ চলছে, যার মাধ্যমে ঐশী গৌরব এবং প্রতাপ প্রকাশ পাচ্ছে। সম্ভবত কেউ বলতে পারে, এখনো লক্ষ লক্ষ মানুষ বেঁচে আছে। এসব যুদ্ধকে তুমি যদি নিজের সত্যতার পক্ষে উপস্থাপন করতে পার, তবে জীবিত প্রত্যেক ব্যক্তিই বলতে পারে, এই যুদ্ধ আমার সত্যতার প্রমাণ। এ সম্পর্কে আমার উত্তর হচ্ছে, এখন পর্যন্ত জীবিত লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষকে যদি পূর্ব থেকেই এ যুদ্ধের আগাম সংবাদ দেয়া হয়ে থাকে তবে এটি প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তির সত্যতার আলামত হতে পারে। কিন্তু তাদেরকে যদি পূর্বেই এ যুদ্ধের

সংবাদ আগাম দেয়া না হয় তবে যাকে এসব যুদ্ধের বিস্তারিত সংবাদ আগাম দেয়া হয়েছে, তারই জন্য এ ঐশী প্রতাপ প্রকাশিত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। (আল্ মওউদ, আনোয়ারুল উলুম, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ৬২৭)

"সে খুব দ্রুত বড় হবে"। [তিনি (রা.) বলেন,] আমি যখন খলীফা হই তখন আমাদের ভাণ্ডারে কেবল চৌদ্দ আনা ছিল আর ঋণ ছিল আঠার হাজার রুপি। এমনকি আমি যখন আমার খিলাফতের যুগে প্রথম প্রচারপত্র রচনা করি, যার বিষয়বস্তু ছিল "কে আছে যে খোদার কাজকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে?" তা ছাপানোর জন্যও আমার কাছে কোন অর্থ ছিল না। তখন আমাদের নানাজানের কাছে কিছু চাঁদার অর্থ জমা ছিল, যা তিনি মসজিদ খাতে লোকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। সেই চাঁদা থেকে দু'শ রুপি তিনি বিজ্ঞাপন ছাপানোর জন্য দেন এবং বলেন, বাইতুল মালে যখন চাঁদা আসতে শুরু করবে, এই ঋণ তখন পরিশোধ হয়ে যাবে। এক কথায়, তার কাছ থেকে সে সময় দু'শ রুপি ঋণ নিয়ে এই বিজ্ঞাপন ছাপানো হয় আর তা করা হয় এমন সময়, যখন জামা'তের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা আমার বিরোধী, জামা'তের অর্থভাণ্ডার শূন্য, সেখানে শুধু মাত্র চৌদ্দ আনা পয়সা জমা ছিল। (চৌদ্দ আনার অর্থ, এক রুপিতে ষোল আনা হয় অর্থাৎ পুরো এক রুপিও ছিল না। আর বর্তমান যুগের হিসেবে ৮৭/৮৮ পয়সা।) আঞ্জুমানের কাঁধে ঋণের বোঝা ছিল আঠার হাজার রুপি, আঞ্জুমানের অধিকাংশ সদস্য ছিল আমার বিরোধী, আঞ্জুমানের সেক্রেটারী আমার বিরোধী, মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকও আমার বিরোধী আর তখন আমি খোদার ইচ্ছায় সেই বিজ্ঞাপনে এই বাক্য প্রকাশ করেছিলাম যে, খোদা তা'লা চান আমার হাতে জামা'তের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হোক, খোদার এ ইচ্ছাকে এখন কেউ বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না। তারা কি দেখে না, তাদের সামনে মাত্র দু'টি পথই খোলা আছে, হয় তারা আমার হাতে বয়আত করে জামা'তের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকবে, নয়তো কামনা ও বাসনার অনুসরণে সেই পবিত্র বাগানকে উপড়ে ফেলুক, যাতে পবিত্র লোকেরা রক্তাশ্রু সিঞ্চন করেছেন। পূর্বে যা কিছু হয়েছে তা তো হয়েছেই কিন্তু এখন এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জামা'তের ঐক্যের একটাই পথ আর তা হল খোদা তা'লা যাকে খলীফা নিযুক্ত করেছেন তার হাতে বয়আত করা, অন্যথায় এর বিরুদ্ধে যে-ই যাবে, সে বিভেদের কারণ হবে। এরপর তিনি (রা.) বলেন– আমি লিখেছি, জগতের সবাই যদি আমাকে মেনে নেয় তবুও আমার খিলাফত বড় হতে পারে না আর খোদা না করুক সবাই যদি আমাকে পরিত্যাগ করে তবুও আমার খিলাফতে কোন পার্থক্য দেখা দিতে পারে না। যেভাবে নবী একাই নবী হন, সেভাবে খলীফাও, একাই খলীফা হন।

অতএব, কল্যাণমণ্ডিত তারা যারা খোদার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। খোদা তা'লা আমার উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা অনেক ভারী আর তাঁর সাহায্য যদি আমার সাথে না থাকে তবে আমি কিছুই করতে পারব না। কিন্তু সেই পবিত্র সত্তার প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা ও দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, তিনি অবশ্যই আমাকে সাহায্য করবেন। মোটকথা, বিভিন্ন ধরণের বিরোধিতা, যেমন: রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃস্থ বিরোধিতাও হয়েছে কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে উন্নতির মহাসড়কে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে তৌফিক দিয়েছেন। (ম্যায় হি মুসলেহ্ মওউদ কি পেশগোয়ি কা মিসদাক হুঁ, আনোয়ারুল উলুম, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ২১৯-২২১)

"তিনি বন্দীদের মুক্তির কারণ হবেন"। এটিও এক ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, তিনি বন্দীদের মুক্তির কারণ হবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীও আল্লাহ্ তা'লা আমার মাধ্যমে পূর্ণ করেছেন। প্রথমতঃ আল্লাহ্ তা'লা আমার মাধ্যমে এমন সব জাতিকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন, যাদের প্রতি মুসলমানদের কোন মনোযোগ ছিল না এবং তারা চরমভাবে লাঞ্ছিত ও পশ্চাদপদ অবস্থায় ছিল। তারা বন্দীদের মতই জীবনযাপন করছিল। তাদের মাঝে কোন শিক্ষাদীক্ষা ছিল না এবং উন্নতমানের কোন সংস্কৃতিও তাদের ছিল না। আর তাদের তরবীয়ত ও শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক কোন ব্যবস্থাও ছিল না। যেমন– আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল। জগৎ তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। তারা শুধুমাত্র বেগার খাটতো আর চাকরবাকরের কাজ করতো। এখনই পশ্চিম আফ্রিকার একজন প্রতিনিধি [যে জলসায় হুযূর (রা.) বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, সেই জলসায় পশ্চিম আফ্রিকার একজন প্রতিনিধিও বক্তৃতা দেন। তার বরাতে হুযূর বলেন,] আপনাদের সামনে বক্তৃতা করেছেন। সেই দেশের কিছু মানুষ যদিও শিক্ষিত কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে প্রত্যন্ত অঞ্চলে এমন অনেক মানুষও রয়েছে যারা কাপড়ও পরিধান করতো না এবং উলঙ্গ চলাফেরা করত। আর এমন বন্য লোকদের মধ্য হতে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমার মাধ্যমে সহস্র সহস্র মানুষ ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করেছে। খ্রিষ্টধর্ম সেখানে ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এখনো কোন কোন এলাকায় খ্রিষ্টধর্মের প্রাধান্য রয়েছে।

কিন্তু আমার নির্দেশনা অনুসারে সেসব অঞ্চলে আমাদের মুবাল্লেগগণ গিয়েছেন এবং মুশরিকদের মধ্য হতে সহস্র সহস্র মানুষকে তারা মুসলমান বানিয়েছেন আর হাজার হাজার মানুষকে খ্রিষ্টানদের কবল থেকে উদ্ধার করে ইসলামে নিয়ে এসেছেন। খ্রিষ্টানদের উপর এর খুবই গভীর প্রভাব পড়েছে। পাদ্রীদের অনেক বড় একটি সংগঠন ইংল্যান্ডে রয়েছে, এরা সরকারের মদদপুষ্ট এবং সরকারের পক্ষ থেকে খ্রিষ্টধর্মের তবলীগ ও প্রচারের কাজে নিয়োজিত। খ্রিষ্টধর্মের অগ্রযাত্রা পশ্চিম আফ্রিকায় কেন বন্ধ হয়ে গেছে তা খতিয়ে দেখে রিপোর্ট প্রদানের উদ্দেশ্যে এ সংগঠনটি একটি কমিশন গঠন করে আর

সেই কমিশন সংগঠনের সামনে যে রিপোর্ট উপস্থাপন করেছে, তাতে ডজনেরও অধিক স্থানে আহমদীয়া জামা'তের কথা উল্লেখ রয়েছে এবং তারা লিখেছে, এই জামা'ত খ্রিষ্টধর্মের উন্নতি ও অগ্রগতি থামিয়ে দিয়েছে। মোটকথা, পশ্চিম আফ্রিকা এবং আমেরিকা উভয় দেশে হাবশী জাতিগোষ্ঠী ব্যাপক সংখ্যায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা এসব জাতির মাঝে তবলীগ করার সুযোগ করে দিয়ে আমাকে এসব বন্দীর মুক্তিদাতা বানিয়েছেন এবং তাদের জীবনমান উন্নত করার তৌফিক দিয়েছেন।

এরপর তিনি (রা.) বলেন, বন্দীদের মুক্তির দিক থেকে কাশ্মিরের ঘটনাও এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নে এক শক্তিশালী প্রমাণ এবং যে ব্যক্তিই এই বিষয় সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করবে সে এটি না মেনে পারবে না যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার মাধ্যমেই কাশ্মিরীদের মুক্তির উপকরণ সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের শত্রুদের পরাস্ত করেছেন। (আল্ মওউদ, আনোয়ারুল উলুম, ১৭তম খণ্ড,পৃ. ৬১৪-৬১৫)

তিনি (রা.) বলেন, এই ভবিষ্যদ্বাণীর অনেক বড় ও গুরুত্বপূর্ণ দু'টো অংশ রয়েছে। প্রথম অংশ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এই শুভসংবাদ দেয়া হয়েছিল যে, আমি তোমার নাম পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেব। এখন কথা শুধুমাত্র পুত্র জন্ম নেয়ার মাধ্যমে তাঁর নাম পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছতে পারত না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর হাতে এমন কাজ সাধিত না হতো যদ্বারা গোটা বিশ্বে তিনি সুখ্যাতি লাভ করতেন। অনেক বড় বড় লেখক রয়েছেন, যারা সারা জীবন বইপুস্তক লেখার কাজে রত থাকেন, এ কারণে তারা খ্যাতি লাভ করেন। অনেকেই মন্দ কাজের কারণেও পরিচিতি লাভ করে। অনেক বড় বড় চোর ও ডাকাতের নামও মানুষ অবহিত হয় কিন্তু তাদের ভালো কিংবা মন্দের খ্যাতি জগৎজোড়া হয় না। কোন একটি এলাকা বা দেশের কোন একটি অঞ্চলে তাদের নাম ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই সংবাদ দিয়েছিলেন, সে তাঁর (আ.) নাম পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবে। অতএব, তিনি (আ.) যদি অসাধারণ মানের খ্যাতি লাভ করেন, কেবল তবেই এই ভবিষ্যদ্বাণী এক মহান ভবিষ্যদ্বাণী বলে গণ্য হতে পারে। অতএব, আমরা দেখেছি এমনটিই হয়েছে। যখন আমি জন্ম নেই তার দু'আড়াই মাস পরই তিনি মানুষের বয়আত গ্রহণ আরম্ভ করেন আর এভাবে পৃথিবীতে আহমদীয়া জামা'তের ভিত রচিত হয়। (ম্যায় হি মুসলেহ্ মওউদ কি পেশগোয়ি কা মিসদাক হুঁ, আনোয়ারুল উলুম, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ২০৭)

তিনি (রা.) বলেন, আমি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম এবং আহমদীয়াত প্রচারের জন্য মিশন প্রতিষ্ঠা করেছি। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন ইন্তেকাল করেন তখন শুধুমাত্র ভারত এবং আফগানিস্তানের কোন কোন এলাকায় আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। অন্য কোন জায়গায় আহমদীয়া মিশন প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কিন্তু, যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা ভবিষ্যদ্বাণীতে বলেছিলেন, তিনি পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসিদ্ধি লাভ করবেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আহমদীয়া মিশন প্রতিষ্ঠার তৌফিক দিয়েছেন। অতএব, আমি আমার খিলাফতের শুরুতেই ইংল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা এবং মরিশাসে আহমদীয়া মিশন প্রতিষ্ঠা করি। এরপর এই ধারা ধীরে ধীরে বিস্তৃত-রূপ ধারণ করেছে। যেমন ইরান, রাশিয়া, ইরাক, মিশর, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, ল্যাগোস, নাইজেরিয়া, গোল্ড কোস্ট (গোল্ড কোস্ট বর্তমানে ঘানা নামে পরিচিত), সিয়েরা লিওন, পূর্ব-আফ্রিকা এবং ইউরোপ। এরপর ইংল্যান্ড ছাড়াও স্পেন, ইতালি, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, পোল্যাণ্ড, যুগোস্লাভিয়া, আলবেনিয়া, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, চীন, জাপান, মালায়া, স্ট্রেইট সেট্‌ল্‌মেন্টস্, সুমাত্রা, জাভা, স্লোভিয়া এবং কাশগারে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মিশন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এসব দেশে অনেক মুবাল্লেগ সরকারের হাতে বন্দী আছে, অনেকে কাজ করছেন এবং অনেকগুলো মিশন যুদ্ধাবস্থার (অর্থাৎ, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের) কারণে সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

মোটকথা, পৃথিবীর এমন কোন জাতি নেই যারা আজ আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে অবহিত নয়। পৃথিবীর এমন কোন জাতি নেই যারা আজ এটি অনুভব করে না যে, আহমদীয়াত এক ক্রমবর্ধমান জোয়ারের ঢল, যা তাদের দেশের দিকে ধেয়ে আসছে। বিভিন্ন সরকার এই প্রভাবকে অনুভব করছে, বরং কতিপয় সরকার একে দমন করার চেষ্টাও করে। (আর এটি শুধু সে যুগের কথাই নয়, বরং বর্তমানেও আমরা এমনটি দেখছি।) আমাদের মুবাল্লেগ যখন রাশিয়াতে যান তখন তাকে অনেক কষ্ট দেয়া হয়েছে, মারধর ও প্রহার করা হয়েছে এবং দীর্ঘদিন তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু খোদার প্রতিশ্রুতি ছিল, এ জামা'তকে তিনি বিস্তৃতি দান করবেন এবং আমার মাধ্যমে একে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি দিবেন, তাই তিনি তাঁর অপার অনুগ্রহ এবং দয়ায় এসব স্থানে আহমদীয়া জামা'তকে পৌঁছে দিয়েছেন বরং অনেক স্থানে বড় বড় জামা'তও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। (দা'ওয়া মুসলেহ্ মওউদ কে মুতা'ল্লেক পুর শওকত এ'লান, আনোয়ারুল উলুম, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ১৫৫-১৫৬)

ভবিষ্যদ্বাণীর বিভিন্ন আঙ্গিক রয়েছে যা তাঁর নিজ সত্তায় মহামহিমার সাথে পূর্ণ হয়েছে এবং কয়েক বার পূর্ণ হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে পূর্ণ হয়েছে আর তা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা প্রকাশ করে চলেছে আর মহানবী (সা.) এবং ইসলামের মহিমা বৃদ্ধি করেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি সর্বদা স্বীয় রহমত বর্ষণ

করা অব্যাহত রাখুন এবং আমাদেরকেও নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার তৌফিক দান করুন।

নামাযের পর আমি একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব, যা (জামা'তের মুবাল্লেগ) মোকাররম মওলানা মুহাম্মদ সিদ্দীক শাহেদ সাহেব গুরুদাসপুরীর। তিনি মোকাররম মিয়া করমদ্বীন সাহেবের পুত্র। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখে ৮৭ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজিউন। তিনি বিভিন্ন দেশে এবং জামা'তের কেন্দ্রে বিভিন্ন পদে থেকে দীর্ঘ ৬০ বছর জামা'তের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। তার গোটা জীবন ধর্মসেবা, লাগাতার সংগ্রাম, দাওয়াত ইলাল্লাহ্ এবং খিলাফতের আনুগত্যের জন্য নিবেদিত ছিল। যতদিন তিনি সুস্থ্য ছিলেন, লাগাতার ধর্মসেবায় রত ছিলেন। কিছু কাল পূর্বে তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হন, যে কারণে তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। ৩১ অক্টোবর ১৯২৮ সনে বাটালা তহশীলের লোধী নাঙ্গলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯১৪ সনে তার পিতা মিয়া করমদ্বীন সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে মওলানা সিদ্দীক সাহেব ১৯৪০ সনে কাদিয়ান এসে মাদ্রাসা আহমদীয়ায় ভর্তি হন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মেধাবী ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আর ক্লাসে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতেন। ১৯৪৭ সনে মাদ্রাসা পাশ করার পর তিনি জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হন। ১৯৪৯ সনে জামেয়া থেকে মৌলভী ফাযেল পাশ করেন। ১৯৫০ সনে জামেয়াতুল মুবাশ্বেরীনের প্রথম যে মুরব্বী-ক্লাস ছিল, তাতে তিনি ভর্তি হন আর ১৯৫২ সালে শাহেদ পাশ করেন। এরপর তবলীগের উদ্দেশ্যে তিনি রাবওয়া থেকে প্রথমবার পশ্চিম আফ্রিকার দেশ সিয়েরা লিওন গমন করেন। ২৩ অক্টোবর ১৯৫২ সনে তিনি করাচী হতে সামুদ্রিক জাহাজ যোগে লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এখানে এক মাস অবস্থানের পর ডিসেম্বরে সামুদ্রিক জাহাজে চেপেই তিনি সিয়েরা লিওনে পৌঁছেন। সেখানে চার বছর দাওয়াতে ইলাল্লাহ্‌র দায়িত্ব পালন করার পর ১৯৫৬ সনের ১৯ অক্টোবর তিনি পাকিস্তানে ফিরে যান। তিন বছর পর্যন্ত তিনি কেন্দ্রে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। ডিসেম্বর ১৯৫৯ সনে আমীর এবং মিশনারী ইনচার্জের দায়িত্ব দিয়ে পুনরায় তাকে সিয়েরালিওনে পাঠানো হয়। ১৯৬২ সন পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৫ জানুয়ারি ১৯৬৬ সনে তিনি ঘানার আক্রা-য় পৌঁছেন এবং সল্টপণ্ড-এ প্রায় দু'বছর পর্যন্ত আহমদীয়া মিশনারী ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৮ সালের জুলাই মাসে তৃতীয় বারের মত সিয়েরা লিওনে নিযুক্ত হন এবং ২৪ মে ১৯৭২ সন পর্যন্ত আমীর ও মিশনারী ইনচার্জের দায়িত্ব পালন করেন। পরে ৩১ জুলাই ১৯৭৩ সনে তিনি আমেরিকা গমন করেন।

আল্লাহ্ তা'লা তাকে চার বছর যুক্তরাষ্ট্রে জামা'তের সেবা করার সৌভাগ্য দিয়েছেন। আমীর হিসেবে তার সিয়েরা লিওনে দায়িত্ব পালনকালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) প্রথমবার আফ্রিকা সফর করেছিলেন। তখন তিনি সেখানেই ছিলেন। পাকিস্তানে বিভিন্ন বিভাগে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। অত্যন্ত বিনয়ী, নিঃস্বার্থ, পরিশ্রমী, লোকদেখানো ভাব থেকে মুক্ত ও নীরব সেবক ছিলেন। তিনি সাদাসিধে প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তার মাঝে গভীর জ্ঞান এবং লেখালেখির অভ্যাস ছিল। দৈনিক আল্ ফযলের মাধ্যমে নিজ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার আলোকে জামা'তের সদস্যদের তিনি উপকৃত করতেন। তার লেখা প্রবন্ধ বিভিন্ন সময় আল্ ফযল পত্রিকার সৌন্দর্য বর্ধণ করত। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) যখন পশ্চিম আফ্রিকা সফরে গিয়েছিলেন তখন তিনি কয়েকজন মুবাল্লেগ সম্পর্কে বলেছিলেন, তারা নাঈম অর্থাৎ অত্যন্ত উন্নত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত আর তাদের মাঝে হুযূর (রাহে.) তার নামও উল্লেখ করেছিলেন।

গোলবাজার এলাকার মোহতরম খলীল আহমদ সাহেবের কন্যা আমাতুল মজীদ সাহেবার সাথে তার বিয়ে হয়, যিনি তার স্বামীর সাথে ওয়াক্‌ফের চেতনা নিয়ে জীবন কাটিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে পাঁচটি পুত্র এবং দু'টি কন্যাসন্তান দান করেছেন। তার এক মেয়ের বিয়ে হয়েছে মুবাল্লেগ সিলসিলাহ্ মাকসুদ আহমদ কমর সাহেবের সাথে এবং তার এক পুত্র সাঈদ খালিদ সাহেব জামা'তের মুরব্বী হিসেবে আমেরিকায় কর্মরত আছেন।

সাঈদ খালিদ সাহেব লিখেন– আমার পিতা জামা'তের একজন নিবেদিতপ্রাণ সেবক, বিনয়ী, ইবাদতকারী, সংগ্রামী এবং খোদার উপর ভরসাকারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি লিখেন, যখন থেকে আমি বুঝতে শিখেছি তার চরিত্রে দু'টি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য দেখেছি। প্রথমত ইবাদতের প্রতি সুগভীর আকর্ষণ অর্থাৎ খোদার অধিকার প্রদান আর দ্বিতীয়ত তাঁর ধর্মের সেবা এবং জামা'তের প্রতি বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য। সর্বাবস্থায় তিনি মসজিদে গিয়ে নামায পড়তেন। জীবনের শেষ বয়সে হাঁটুতে সমস্যা থাকার কারণে তিনি হেঁটে বা সাইকেল চালিয়ে মসজিদে যেতে পারতেন না, তাই আমার উপর দায়িত্ব ছিল আমি যেন আব্বাজানকে গাড়িতে করে নিয়মিত মসজিদে নিয়ে যাই। কোন কারণে আমার বিলম্ব হলে অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি বলতেন, আমার নামায নষ্ট হয়েছে। ফরয নামাযের মতো সর্বদা তাহাজ্জুদ নামাযও নিয়মিত পড়তেন। কখনোই এতে ব্যতিক্রম করতেন না। সফর করে ক্লান্ত হয়ে ফিরলেও তিনি কখনো তাহাজ্জুদ নামায নষ্ট হতে দিতেন না।

তিনি আরো বলেন, পাতিলে যেভাবে গরম পানি ফুটতে থাকে, সেভাবে নামাযে তার কান্নার আওয়াজ আমি শুনেছি অর্থাৎ

তাহাজ্জুদের নামাযে। সন্তানদের নামাযের ব্যাপারেও তিনি চিন্তিত থাকতেন এবং সন্তানদের সাথে তিনি যদি কখনো কঠোরতা করতেন তবে তা শুধুমাত্র বাজামা'ত নামাযের জন্যই করতেন। আমাদের এই মুবাল্লেগ সাঈদ খালিদ সাহেব আরো লিখেন, তিনি যেহেতু পিতার সেবা করতেন তাই ২০১০ সনে যখন তার পদায়ন আমেরিকাতে হয় তখন তিনি বলেন, আমার চিন্তা হচ্ছে, এই অপারগতার কথা আমি খলীফায়ে ওয়াক্তকে লিখে দিচ্ছি। তখন তিনি বলেন, কখনো এমনটি করো না, তুমি ওয়াকেফে যিন্দেগী তাই তাড়াতাড়ি কর্মস্থলে চলে যাও।

এরপর তিনি বলেন, খিলাফতের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ছিল। খুতবায় হুযূর (আই.) যা বলতেন, এর একেকটি কথার উপর আমল করার চেষ্টা করতেন এবং আমাদেরকেও তা পালন করতে বলতেন। আল্লাহ্‌র উপর গভীর আস্থা ছিল। তিনি বলেন, একবার আমার ভাই আমেরিকা থেকে আসেন এবং তিনি জানতে পারেন যে, অর্থের অভাবে বাড়ির একটি চাহিদা পূর্ণ হচ্ছিল না। আমার ভাই আব্বাজানকে বলেন, আপনি আমাকে কেন বলেন নি? ভাইকে কাছে বসিয়ে তিনি বলেন, অর্থ যদি চাইতেই হয় তবে কেন আমি তা আমার খোদার কাছে চাইব না? এ জন্যই আমি তোমার কাছে টাকা চাইব না। তুমি নিজের সামর্থ্য অনুসারে যে সেবা করতে চাও তা করতে পার।

তার এক পুত্র আমেরিকায় ইঞ্জিনিয়ার। তিনি বলেন, আমি লাহোর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করি এবং আমেরিকার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আবেদন করি। ভর্তি হওয়ার পর আমি ছাত্র ভিসার জন্য আবেদন করি, কিন্তু এক্ষেত্রে কিছু সমস্যা ছিল। অল্প কিছু দিনের ভেতর আমেরিকাতে ক্লাশ শুরু হতে যাচ্ছিল বলে আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। পিতা আফ্রিকাতে ছিলেন। অবস্থার কথা উল্লেখ করে আমি তাকে দোয়ার জন্য লিখি। আমি লাহোরেই ছিলাম। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠার পর আমার মনে হল, আমেরিকান কনস্যুলেটে একবার যাওয়া উচিত। তাই আমি সেখানে চলে যাই। আমেরিকান কনস্যুলেট বলেন, তুমি তো এখনো টেস্ট পাশ কর নি, এখানে কীভাবে চলে এলে? আমি তাকে পুরো ঘটনা খুলে বলি। ভর্তির কথা বলি। ক্লাশ শুরু হতে যাচ্ছে একথাও তাকে জানাই। আমি তাকে বলি, আমি যদি যোগ্য না হতাম, তবে তো বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে ভর্তিরই সুযোগ দিত না। তখন আমেরিকান দূতাবাসের কনস্যুলেট আমাকে বলেন, তুমি বস। এরপর আধা ঘন্টা পর আমাকে ভিসা দিয়ে দেয়। আমি যখন রাবওয়া ফিরে আসি তখন বাবার চিঠিও এসে গিয়েছিল যা আফ্রিকা থেকে দশ বারো দিন পূর্বে তিনি লিখেছিলেন। তাতে লেখা ছিল, আমি খোদার কাছে দোয়া করেছি আর খোদা আমাকে জানিয়েছেন, তুমি ভিসা পেয়ে গেছ।

তার মুরব্বী জামা'তা লিখেছেন, দোয়ার প্রতি তার গভীর বিশ্বাস ছিল। তিনি যখন সিয়েরা লিওন থেকে ফিরে আসছিলেন আর খলীল আহমদ মুবাশ্বের সাহেবকে কাজের দায়িত্ব হস্তান্তর করছিলেন তখন খলীল সাহেব বলেন, কঠিন পরিস্থিতিতে আমার কী করা উচিত? এমন পরিস্থিতিতে জামা'তকে কীভাবে সামলাব? আপনি কীভাবে সামলাতেন? তখন তিনি একটি কথাই বলেন, যখনই কঠিন পরিস্থিতি দেখা দিত, দরজা বন্ধ করতাম [আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও এ কথাই বলেছেন] তখন আমি থাকি আর আমার খোদা থাকেন। এই ব্যবস্থাপত্রই সকল বিপদ থেকে উদ্ধারের উপায়।

মজীদ শিয়ালকোটি সাহেব লিখেছেন, মুরব্বীদের মাঝে যদি কোন আলসতা দেখা যেতো তবে তিনি খুব কঠোরতা প্রদর্শন করতেন। কিন্তু তাদের অনেক খেয়ালও তিনি রাখতেন এবং আদরস্নেহও করতেন। সফরে গেলেও নিজের পানাহারের খরচ সর্বদা নিজের পকেট থেকেই ব্যয় করতেন। বাদাম ভাজা বা মাছ ভাজা খেয়ে নিতেন কিন্তু জামা'তের উপর খরচের বোঝা চাপাতেন না।

জামা'তের আরেক মুরব্বী হানিফ কমর সাহেব লিখেন– সিয়েরা লিওনে গিয়ে আমি পূর্বের বুযূর্গ মুবাল্লেগদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতাম। সেখানে আমাদের একজন আফ্রিকান আহমদী ভাই ছিলেন সালমান মাসতেরে সাহেব। তার সাথে মাঝে মধ্যে আমার সাক্ষাৎ হতো। মৌলভী সাহেব সম্বন্ধে তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, উনি তো একজন ফিরিশ্‌তা ছিলেন। আমাদের এই আফ্রিকান ভাইয়ের মন্তব্যটি একেবারেই সত্য। তার অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য ও গুণ ছিল ফিরিশ্‌তা-সদৃশ। আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে সর্বদা এমন ওয়াকেফীনে যিন্দেগী দান করুন। খোদার প্রতি তার দৃঢ় আস্থা ছিল এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সন্তুষ্ট থাকতেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং নিজ প্রিয়ভাজনদের মাঝে তাকে স্থান দিন। তার সন্তানদের মাঝেও খিলাফত এবং জামা'তের প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং বিশ্বস্ততা সৃষ্টি করুন, বিশেষ করে তার ওয়াকেফে যিন্দেগী জামাতা ও পুত্রকে মোকাররম মওলানা সাহেবের প্রত্যাশা অনুযায়ী বিশ্বস্ততার সঙ্গে নিজেদের ওয়াক্‌ফের দায়িত্ব পালন করার তৌফিক দান করুন।

(সূত্র: আল ফযল ইন্টান্যাশনাল, ১৩-১৯ মার্চ ২০১৫, ২২তম খণ্ড, ১১তম সংখ্যা, পৃ. ০৫-১০)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রস্থ স্বল্প পরিসরে সাত সহস্রাধিক খোদা-প্রেমাকাঙ্খী মানুষের হৃদয় নিংড়ানো দোয়া ও ইস্তেগফারে আল্লাহ্ তা'লার করুণাসিক্ত হয়ে সফল সমাপ্তিতে পৌঁছালো ৯৪তম সালানা জলসা ২০১৮

মুআয়েনা (প্রস্তুতি কার্যক্রমের প্রাক আনুষ্ঠানিক পরিদর্শন)

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর ৯৪তম জলসা সালানায় হুযূর (আই.)-এর পক্ষ থেকে আগত সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম সৈয়দ মাহমুদ আহমদ শাহ সাহেবের সভাপতিত্বে গত ৩১ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখ রাত ৮ টার সময় বকশীবাজার দারুত তবলীগ প্রাঙ্গণে মুআয়েনা (সরেজমিনে পরিদর্শন) অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন মাওলানা মোহাম্মাদ সোলায়মান সুমন। এরপর হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি জলসা সালানার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন নাযেমের সঙ্গে পরিচিত হন ও কুশল বিনিময় করেন। এরপর তিনি জলসা সালানার দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল সদস্যের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত কার্যকরী এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

তিনি তার বক্তব্যের শুরুতেই বলেন, "আপনাদের কাছে আমার নিবেদন হল এম.টি.এ-এর মাধ্যমে আপনারা হুযূরের জলসার পরিদর্শনের যে নমুনা তা দেখেছেন। আমাদের দায়িত্ব হল, আমরা যখন হুযূরের কোন অনুষ্ঠান দেখি সে অনুষ্ঠানে হুযূর যে সমস্ত নির্দেশনা প্রদান করেন আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে সে সমস্ত কাজ যেন আমরা নোট করি আর সে অনুযায়ী যেন আমরা কাজ করে যাই। কেননা আমরা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে কল্যাণ ও আশীষ যা কিছুই লাভ করতে যাচ্ছি তা আমরা হযরত খলীফাতুল মসীহর আনুগত্যের ফলেই লাভ করতে যাচ্ছি। কুরআন শরীফে আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে একটি শিক্ষা দিয়েছেন আর তা হল, তোমরা ফেরেশতাদের মত কাজ করা শিখে নাও কেননা তারা কখনো ক্লান্ত হয় না। আর ফেরেশতাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল **'ইয়াফআলুনা মা ইউ'মারুন'** অর্থাৎ তারা তা করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়। যদি আমরা তাদের এই বৈশিষ্ট্যটি রপ্ত করে নেই তবে আমাদের উপরস্থ যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আছেন তিনি আমাদের যে আদেশই দেন না কেন তা আমাদের ভাল লাগুক বা না লাগুক, আমরা যদি তা করে ফেলি তবে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করতে পারছি। **'ইয়াফআলুনা মা ইউ'মারুন'** শিক্ষা অনুযায়ী আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে এর উপর আমল করা উচিত এবং আমাদের কর্মকর্তাদের আনুগত্য প্রদর্শন করা উচিত।

আরেকটি চমৎকার শিক্ষা আছে কুরআন শরীফে আর তা হচ্ছে, **"কুল্লুন ফি ফালাকিন ইয়াসবাহুন"** অর্থাৎ প্রত্যেকটি গ্রহ এবং নক্ষত্র নিজ নিজ কক্ষপথে কোন বাধা সৃষ্টি না করে কাউকে আঘাত না দিয়ে নিজ গতিতে চলতে থাকে। ঠিক এভাবেই আমাদের কাজ সমাধা করা উচিত। ঠিক একইভাবে গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথের মত আমরা যদি নিজ নিজ কাজ সম্পাদন করি, কারো সাথে কারো যদি সংঘর্ষ না হয় আর এমন অবস্থা যদি সৃষ্টি করতে পারি তাহলে এটা আমাদের জন্য একটি সাফল্য বলে পরিগণিত হবে। আপনি যত পরিশ্রম করবেন আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, আল্লাহ্ তা'লা এর পুরস্কার অবশ্যই দিবেন কেননা আল্লাহ তা'লা কোন ব্যক্তির আন্তরিক পরিশ্রম কখনোই বিনষ্ট হতে দেন না। পরিশ্রমের মাঝে যদি কিছু ঘাটতি থেকেও যায় তবে পাশাপাশি দোয়ার অভ্যাসের মাধ্যমে সে ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব। আমাদের প্রত্যেকের এই অভ্যাসটি গড়ে তোলা উচিত। খোদা তা'লা আমাদের প্রত্যেককে খেলাফতের সৈনিক বানিয়ে দিন এবং তাঁর আনুগত্যে যেন আমরা জীবন কাটাই আর এভাবে যেন আমরা সফলতা লাভ করতে পারি। (আমিন)

এরপর দোয়ার মাধ্যমে মুআয়েনা শেষ হয়।

জলসার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ রোজ শুক্রবার জুমুআর নামাযের পর বেলা তিনটায় ৯৪তম জলসার উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। প্রথমে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলভি হাফেয আবুল খায়ের সাহেব। এরপর নযম পরিবেশন করেন জনাব কাশেম হোসাইন পিয়াস। নযম পরিবেশনের পর হুযূর

(আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম সৈয়দ মাহমুদ আহমদ শাহ সাহেব। তিনি তার বক্তৃতার শুরুতেই তাশাহহুদ তাউয পাঠের পর বলেন, বনী ঈসরাইল জাতিকে একটি গরু কুরবানী করতে বলা হয়েছিল। তারা তখন নানান ধরণের প্রশ্ন উত্থাপন করতে থাকে। ফলাফলস্বরুপ তারা আল্লাহ তা'লার বিরাগভাজন সাব্যস্ত হয়। এই ঘটনার মাধ্যমে তিনি আমাদেরকে এতায়াতের বিষয়টি ভালভাবে বুঝান। পাশাপাশি খেলাফত একটি **হাবলুল্লাহ** যা আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টি স্পষ্ট করে। তিনি বলেন, আনুগত্য এমন এক বিষয় যার ফলে আত্মা এক ধরণের স্বাদ ও আলো লাভ করে।

অতঃপর তিনি মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করেন যার মধ্যে মদের মটকা ভাঙার প্রসিদ্ধ ঘটনাটিও ছিল। অনুরুপভাবে মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবীদের আনুগত্যের নমুনা প্রদর্শন কওে তিনি বিভিন্ন ঘটনার অবতারণা করেন। তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সেই উক্তিটি আবারও আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যেখানে তিনি বলেছিলেন, কতইনা উত্তম হত যদি জগতের সবাই নুরুদ্দীন হয়ে যেত। এরপর তিনি সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমাদের একটাই কাজ আর তা হল "সামে'না ওয়া আতা'না" অর্থাৎ আমরা শুনলাম এবং মান্য করলাম। পরিশেষে তিনি বলেন, আমরা সেই সব ভাগ্যবান ব্যক্তি যারা খলীফাকে দেখার এবং মানার সৌভাগ্য লাভ করেছি। তার বক্তৃতার শেষে দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে প্রথম অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

অতঃপর বক্তৃতা প্রদান করেন, মাওলানা বশিরুর রহমান সাহেব। বক্তৃতার বিষয় ছিল, **''আল্লাহ্ তা'লাকে চেনা ও তাঁকে লাভ করার উপায়''**। তিনি বলেন, ধর্মের মৌলিক বিষয় হচ্ছে স্রষ্টার অস্তিত্ব অর্থাৎ, খোদা বা আল্লাহ তা'লার অস্তিত্ব। আল্লাহ তা'লাকে চেনা এবং তাঁকে লাভ করার বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে আর সে মাধ্যম গুলোর মধ্যে একটি মাধ্যম হচ্ছে তাঁর গুণাবলী।

এরপর **'ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সুমহান আদর্শ'** বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মাওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান সাহেব। তিনি বলেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পারিবারিক পর্যায়ে পিতামাতার সম্মান, স্ত্রী ও কন্যাদের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে এমনকি সন্তানদের মাঝে সমতা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন আদর্শ তুলে ধরেন। একইভাবে সামাজিক পর্যায়ে অর্থাৎ দরিদ্র, অসহায়, অধিনস্ত দাস,প্রতিবেশী ও শত্রুদের সাথে তিনি(সা.) কেমন উত্তম আদর্শ দেখিয়ে ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন তা তুলে ধরেন। তেমনিভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠার ইসলামী শিক্ষাও পবিত্র কুরআন ও হযরত মুহাম্মদ(সা.)-এর জীবনাদর্শ থেকে তুলে ধরেন। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণিতে যে অন্যায় ও অসমতা ছিল মহানবী (সা.) নিজের আদর্শ দিয়ে সেসব অন্যায় ও অসমতা দূর করে এবং যেখানে বর্বরতা ও হিংস্রতা ছিল সেখানে ভালোবাসা ও বিনয়ের শিক্ষা দিয়ে আক্ষরিক অর্থে সকল পরিসরে ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন।

অতঃপর **"কুরআন শরীফের অতুলনীয় সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য"** বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন শ্রদ্ধেয় মওলানা আলহাজ্জ সালেহ আহমদ। তাশাহ্হুদ তাউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর তিনি বলেন, কুরআন আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এমন এক মহান বাণী যা অনুধাবনের সাথে পাঠ করলে কোন মানুষ কোন খারাপ কাজ করতেই পারে না। এটি এমন এক গ্রন্থ যা কিয়ামত কাল পর্যন্ত সকল মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন মেটাতে সার্বিকভাবে সক্ষম।

জলসার দ্বিতীয় দিন সকালের অধিবেশনে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মাওলানা ফুরাদ আহমদ। এরপর নযম পরিবেশন করেন জনাব জাকির হোসেন। নযম পরিবেশনের পর বক্তৃতা পর্ব শুরু হয়।

প্রথম বক্তা ছিলেন শ্রদ্ধেয় মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী সাহেব। তার বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল **'নামায প্রতিষ্ঠার প্রকৃত তাৎপর্য এবং আমাদের কর্তব্য'**। তিনি তার বক্তৃতার শুরুতেই সূরা যারিয়াতের ৫৭ নং আয়াত তেলাওয়াত করেন। অর্থাৎ খোদা তা'লা বলছেন, "আমি জ্বীন ও মানুষকে আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।" এরপর তিনি কয়েকটি হাদীস পেশ করেন। উদাহরণস্বরুপ– আস্‌সালাতু ইমাদুদ দ্বীন, আস্‌সালাতু মিরাজুল মুমেনীন, আদ্ দোয়ায়ু হুকুকুল ইবাদাতে। তিনি বলেন, দোয়াই আসল ইবাদত। আর দোয়ার জন্য যে পরিস্থিতি দরকার তাই নামায। ইবাদতের প্রধান বিষয় নামায বা খোদার সামনে ঝুঁকা। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, আল্লাহকে ভালবাসার নিয়ম হল তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী ইবাদতের উপর আমল করা। তিনি (আ.) আরো বলেছেন, আল্লাহকে বাদ দিয়ে

অন্য কারো প্রতি ঝুঁকলে ইবাদত বা নামায হবে না। আল্লাহ স্রষ্টা, বান্দা সৃষ্টি। তাঁর নিকট যেতেই হবে। অপর এক স্থানে তিনি (আ.) বলেছেন, নামায বাজামা'ত পড়ার নির্দেশ পাওয়া যায়। একাকী নামায পড়ার নির্দেশ নেই। সূরা ফাতিহায় আমাদের এই শিক্ষাই দেয়া হয়েছে, **"ইয়্যাকা না'বুদু"** অর্থাৎ আমরা তোমারই ইবাদত করি। এখানে "আমরা" এসেছে "আমি" নয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.) বলেছেন, মুহাম্মদ (সা.) যে নামায পড়েছেন, তাই প্রকৃত নামায। তিনি হুযুরের খুতবা শুনার প্রতি শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেছেন, ইকামাতুস সালাতের অর্থ হল, সময়মত নামায প্রতিষ্ঠা করা। অত:পর তিনি বলেন, আমাদের ওযূ সঠিকভাবে করতে হবে কেননা নামায ওযূর মাধ্যমেই শুরু হয়। নামাযে মনোযোগী হবার দৃষ্টন্ত দিতে গিয়ে তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর একটি উদাহরণ পেশ করেন আর তা হল, তিনি (আ.) বলেছেন, যেভাবে পানাসক্ত ব্যক্তি নেশা গাঢ় হবার জন্য অনবরত মদ পান করতে থাকেন ঠিক সেভাবে নামাযে মনোযোগী হবার জন্য আমাদের নিয়মিত নামায আদায় করা উচিত।

এরপর বক্তৃতা করেন মাওলানা জহির উদ্দীন আহমদ সাহেব। তার বক্তৃতার বিষয় ছিল, **'ঐশী খিলাফত ও আমাদের দায়-দায়িত্ব'**। তিনি তার বক্তৃতার শুরুতেই সূরা নূরের ৫৬ নং আয়াত তেলাওয়াত করেন। তিনি বলেন, মুসলমানের মাঝে এক শ্রেণী আছে যারা বলে খিলাফতের প্রয়োজন নেই। কিন্তু মুসলমানদের এই খারাপ অবস্থার প্রতি তাদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। তিনি বলেন, কিছু মানুষ আছে যারা ক্ষমতার বলে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করতে চায় ও তারা খিলাফতের নামে বিভিন্ন দেশের মানুষকে সংগঠিত করছে। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণীতে রয়েছে, **"খিলাফাতুন আলা মিনহাজিন নবুওয়ত"** অর্থাৎ নবুওয়তের পদ্ধতিতে পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী মসীহ মাওউদ (আ.)-এর খলীফাদের মাধ্যমে পূর্ণতা পেয়েছে। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে অর্থাৎ ১৩০৬ হিজরীতে আগমন করেছেন ও তাঁর পর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অতঃপর বক্তৃতা প্রদান করেন শ্রদ্ধেয় মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব। তার বক্তৃতার বিষয় ছিল, **'ইসলামী হিজাব: নারীর সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক'**। তিনি তার বক্তৃতার শুরুতেই সূরা নূরের ৩১ ও ৩২ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেন। এরপর তিনি বলেন, "আলহায়ায়ু মিনাল ঈমান" লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। অতঃপর তিনি বলেন, নারী বাড়ির সম্মানস্বরূপ। তাই এই মহান সম্পদের সুরক্ষা করা উচিত। কেউ কেউ মনে করেন পর্দা ছাড়া নারীদের প্রকাশ করাই হল সভ্যতা। কিন্তু কুরআন এর বিপরীত শিক্ষা প্রদান করে। তিনি বেগম রোকেয়ার পর্দা সংক্রান্ত কিছু উক্তি পড়ে শুনান। যদি আজ কেউ পর্দা বা হিজাব পরিহার করে তবে আগামীতে সে নামাযও ত্যাগ করবে, রোজাও ত্যাগ করবে। পর্দা শুধু নারীদের জন্যই নয় বরং পবিত্র কুরআন পুরুষদেরকেও দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ দেয়। কেননা এটি পবিত্রতা অর্জনের জন্য আবশ্যক। পরিশেষে তিনি কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'নারী' কবিতার কয়েকটি পঙক্তি উল্লেখ করেন।

"কোন কালে একা হয় নি কো জয়ী পুরুষের তরবারী

প্রেরণা দিয়াছে শক্তি দিয়াছে বিজয়লক্ষী নারী"

এরপর হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম মাওলানা সৈয়দ মাহমুদ আহমদ শাহ সাহেব বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি হিংসা-বিদ্বেষ এবং এ থেকে বাচাঁর উপায় সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁর বক্তৃতার শুরুতেই তিনি কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করেন। আর তা হল **"লা খাওফুন আলাইহিম ওয়ালাহুম ইয়াহযানুন"**। তিনি বলেন. হিংসা-বিদ্বেষ পুণ্য কর্মকে নষ্ট করে দেয় যেমনিভাবে আগুন খড়-কুটা পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, **'যে ব্যক্তি কুরআনের ৭০০ আদেশ থেকে একটিও বাদ দেয় সে নিজ হাতে পরিত্রাণের দরজা বন্ধ করে দেয়।'** তিনি (আ.) আরো বলেছেন, **'সেই নামায ও রোযার কী সার্থকতা যে মসজিদে দাড়িয়ে তুমি নামায পড়েছ সেখানে দাড়িয়েই অন্যের নামে গীবত করছ?'** মহানবী (সা.) বলেছেন, 'হিংসুক সেই ব্যক্তি যে আমার নেয়ামতের শত্রু। আর আমি যা বন্টন করি তাতে সে সন্তুষ্ট হয় না।' তিনি বলেন, হিংসার কারণেই আদমের এক পুত্র অন্য পুত্রকে হত্যা করেছিল। হিংসার অনিষ্ট থেকে বাচাঁর জন্য আমাদের দোয়া করা উচিত। রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, লোকদের ছিদ্রন্বেষণ করো না, হিংসা করো না, গীবত করো না বরং পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। অহংকারের কারণেই ইবলীশ আদমকে

সিজদা করা থেকে বিরত থেকেছিল। খলীফাতুল মসীহ খামেস (আই.) বলেন, "হিংসাকারীর অবস্থা এমন যেন সে জাহান্নামের পূজ পান করছে।" হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বাচাঁর উপায় মহানবী (সা.) আমাদেরকে বাতলে দিয়েছেন আর তা হল তিনি (সা.) বলেন, 'হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বাচাঁর জন্য তোমরা একে অপরকে সালাম দাও।'

এই বক্তৃতার মাধ্যমে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে।

তৃতীয় অধিবেনের শুরুতে পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরান থেকে তিলাওয়াত করেন মাওলানা সালাহ্উদ্দীন আহমদ। এরপর নযম পরিবেশন করেন জনাব সৈয়দ যুবায়ের আহমদ।

নযম পরিবেশনের পর বক্তৃতা পর্ব শুরু হয়। প্রথম বক্তা ছিলেন মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন সাহেব। তার বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল **"আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে মূল দুটি আপত্তির খণ্ডন"**/ প্রথম আপত্তি হল বনী ইসরাঈলের নবী হযরত ঈসা (আ.) জীবিত আছেন। পক্ষান্তরে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন যে, তিনি স্বাভাবিক মানুষের মত মারা গেছেন। একথা বলার কারণে মির্যা সাহেবকে কুফরী ফতোয়া পর্যন্ত দেয়া হয়েছে। কেউ তাকে জীবিত মনে করে আবার কেউ তাকে ঈশ্বরপুত্র ঈশ্বর মনে করে। তিনি বিভিন্ন আয়াত, হাদীস এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে এই আপত্তিটির খণ্ডন করেন। ২য় আপত্তিটি হল, আহমদীরা নাকি মহানবী (সা.)-কে শেষ নবী অর্থাৎ খাতামান্নাবিয়্যীন বলে মানে না। এই আপত্তির খণ্ডনে তিনি প্রথম আপত্তিটি তুলে ধরে দর্শকের সামনে একটি প্রশ্ন তুলে ধরেন আর তা হল, যদি হযরত ঈসা (আ.) জীবিত থাকেন তবে শেষ নবী কে হন? তিনি বলেন, আমরা মহানবী (সা.)-কে মূলত সব অর্থে শেষ নবী হিসেবে মান্য করি। প্রথমত, তিনি শরীয়তবাহী হিসেবে শেষ নবী। দ্বিতীয়ত, উৎকর্ষের দিক হতে বা আধ্যাত্মিক উচ্চ মার্গের ভিত্তিতেও তিনি শেষ নবী।

এরপর বক্তৃতা পর্বে মোহতরম আলহাজ্ব আহমদ তবশীর চৌধুরী সাহেব **"বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় যুগ খলীফার ভূমিকা"** বিষয়ে তার মূল্যবান বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন উদ্ধৃতি উল্লেখ করেন যেখানে তরবারীর জিহাদ রহিত করার শিক্ষা রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন খলীফাদের কালজয়ী কর্মক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করেন। বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) সমগ্র বিশ্বকে বারংবার যে শান্তির বাণী প্রচার করে যাচ্ছেন এবং মানবতার নেপথ্যে গান গেয়ে যাচ্ছেন তারই বর্ণনা বক্তা অত্যন্ত সুনিপুণভাবে বর্ণনা করেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে বর্তমান হুযুরের যে শান্তির বাণী পৌঁছে গেছে সে অনুযায়ী যদি সকলে সাবধান না হয় তবে দুর্ভোগ অবশ্যম্ভাবী। পরিশেষে তিনি বলেন, যারাই খলীফার আদেশ অমান্য করেছে তারা ভূপৃষ্ঠে কীট-পতঙ্গের ন্যায় পদদলিত হয়েছে।

অতঃপর বক্তৃতা পর্বে **"আল কুরআন ও প্রকৃত জিহাদ"** বিষয়ে মূল্যবান বক্তৃতা প্রদান করেন অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী। তিনি সূরা কাফিরুন এর ৭ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন যার অর্থ হল, "তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য, আমার জন্য আমার ধর্ম"। কুরআন শরীফ থেকে আরো একটি আয়াত তুলে ধরেন যেখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'লা ফিতনা-ফাসাদ পছন্দ করেন না। সব ধর্মই মানবিকতার শিক্ষা দেয়। কুরআন প্রতিটি সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করতে শিক্ষা দেয়। আর চিন্তা-ভাবনা মানে হল তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা। এভাবে তিনি সমস্ত বক্তৃতায় কুরআনের আলোকে প্রকৃত জিহাদের তত্ত্বকথা বর্ণনা করেন।

এই অধিবেশনে আমন্ত্রিত মেহমান হিসাবে আগত সুশীল সমাজের শ্রদ্ধেয় শাহরিয়ার কবির সাহেব, হাক্কানী মিশনের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর মেসবাউল ইসলাম সাহেব, শ্রী করুনানন্দ থেরু, জনাব জুলফিকার আলি মানিক সাহেব, বাংলাদেশ হিন্দু সম্প্রদায়ের কো-প্রেসিডেন্ট কাজল দেবনাথ, ব্রাদার গিয়ম, শ্রীমতী পদ্মাবতী দেবী, ধনবাড়ি উপজেলার চেয়ারম্যান জনাব শফিকুল ইসলাম সাহেব এবং প্রফেসর আনোয়ার হোসেন সাহেব শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। পরিশেষে আমাদের আহমদী প্রবীণ বুযুর্গ এডভোকেট মুজিবুর রহমান সাহেবের বড় ছেলে আযিযুর রহমান ওয়াক্কাস সাহেব তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন।

এই বক্তৃতার মাধ্যমে এই অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে।

জলসার তৃতীয় দিন সকালের অধিবেশনের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব ইকরাম আহমদ খান ফাহিম। এরপর নযম পরিবেশন করেন মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার, মুরুব্বি সিলসিলাহ।

নযম পরিবেশনের পর বক্তৃতা পর্ব শুরু হয়। প্রথম বক্তা ছিলেন প্রফেসর আব্দুল্লাহ শামস বিন তারিক সাহেব। তার বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল **"ইসলামের সেবায় আর্থিক কুরবানী ও ওসিয়্যত ব্যবস্থা"**। বক্তৃতার শুরুতেই তিনি সূরা মুহাম্মদের ৩৯ আয়াত তেলাওয়াত করেন। তিনি বলেন, এই আয়াতটিতে বলা হচ্ছে আমরা সেই জাতি যাদেরকে খোদা তা'লার পথে কুরবানী করতে আহবান করা হয়েছে। আবার এটিও বলা আছে যে এরাই কুরবানী করতে অস্বীকার করবে। এরপর

অন্য এক জাতিকে কুরবানী করার জন্য আহবান করা হবে। সাহাবারা মুহাম্মদ (সা.)-কে সেই একই প্রশ্ন করেছিলেন যা সূরা জুমুআয় তাঁর (সা.)-এর ২য় আগমনের সংবাদের সময় করেছিলেন যে তারা কারা? তখন মুহাম্মদ (সা.) সেই একই উত্তর প্রদান করেন। মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, হে বন্ধুগণ! এখন ধর্মের জন্য খেদমত করার সময়। আমরা সৌভাগ্যবান যে আমরা কুরবানী করার সুযোগ পাচ্ছি। অতঃপর তিনি বলেন, হয়ত আমরা এখন সংখ্যায় নগণ্য। আমাদেরকে সবাই এখন সেভাবে চিনে না। কিন্তু একদিন না একদিন আহমদীরা বিজয় লাভ করবে। কিন্তু এই বিজয়ের পূর্বে যারা খরচ করে ও জিহাদ করে তাদের সমকক্ষ কেউ হতে পারে না। পরিশেষে তিনি খলীফাতুল মসীহ আল খামেসের একটি উদ্ধৃতি পেশ করেন তা হল, "কতঅঙ্কের চাঁদা দেয়া হয় তা মুখ্য নয় বরং সঠিক আয়ের উপর দেয়া হয়েছে কিনা সেটি মূল বিষয়।

এরপর বক্তৃতা প্রদান করেন মাওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান। তার বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল **"হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর রসূল প্রেম"**। বক্তৃতার শুরুতেই তিনি সূরা আলে ইমরানের ৩১ নং আয়াত তেলাওয়াত করেন। যেখানে আল্লাহ তা'লা বলেন, "হে নবী তুমি বলে দাও, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসার দাবি কর তবে এই রাসূলের আনুগত্য কর তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।" ইমাম মাহদী (আ.) রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরিপূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর ভালবাসা অর্জন করেছেন। আর এ কারণেই আল্লাহ তা'লা তাকে যুগের মসীহ হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। মসীহ মাওউদ (আ.) যেভাবে রসূলুল্লাহ (সা.)-কে ভালবেসেছেন একইভাবে তিনি চেয়েছেন তাঁর জামাতের প্রত্যেক সদস্য যেন রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভালবাসায় ও আনুগত্যে বিলীন হয়ে যায়। মূলত তিনি একটি রসূলপ্রেমী জামাত সৃষ্টি করতে চেয়েছেন এবং তা তিনি করে দেখিয়েছেন।

পরবর্তী বক্তা ছিলেন আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব। তার বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল **"সঠিক জীবনসঙ্গী নির্বাচনে ইসলামী শিক্ষা"**। তিনি তার বক্তৃতার শুরুতে বলেন, বাড়িকে জান্নাত বানানো পুণ্যবতী স্ত্রীর কাজ। হাদিসে রয়েছে, "যে ব্যক্তি বিয়ে করেছে সে ধর্মের অর্ধেক সম্পন্ন করেছে।" এছাড়া মহানবী (সা.) বলেছেন, "চারটি বিষয় দেখে স্ত্রী নির্বাচন করা হয়ে থাকে। কেউ ধন-সম্পদ, কেউ বংশ-মর্যাদা, কেউ সৌন্দর্য, কেউ ধার্মিকতা দেখে থাকে। সুতরাং তোমরা ধার্মিকতাকে প্রাধান্য দাও। অন্যথায় তোমাদের হাত ধূলায় ধূসর থাকবে।" একজন নেক জীবনসঙ্গীর জন্য অনেক বেশি দোয়া করা উচিত। আর এর মাধ্যমেই খুব সহজেই একটি ঘর জান্নাত সদৃশ হতে পারে।

এরপর বক্তব্য প্রদান করেন মাওলানা সৈয়দ মোজাফফর আহমদ। তার বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল **"শেষ যুগে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের শুভাগমন ও তাঁর সত্যতা"**। বক্তৃতার প্রারম্ভে তিনি সূরা জুমুআর ৪ নং আয়াত তেলাওয়াত করেন। তিনি উল্লেভখ করেন, কুরআন অনুসারে শেষ যুগের সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে। তাই এখনই মসীহ মাওউদের আগমনের সময়। এরপর তিনি কুরআনে বর্ণিত শেষ যুগের বিভিন্ন লক্ষণের বর্ণনা দেন যা সূরা তকভীরে বর্ণিত হয়েছে। তিনি ইমাম মাহদীর আগমন সম্পর্কিত বিভিন্ন হাদিস ও তার পূর্ণতা প্রাপ্তি সম্পর্কে আলোকপাত করেন। বক্তৃতার এক পর্যায়ে তিনি অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে উল্লেখিত শেষ যুগের আগমনকারী মসীহর ভবিষ্যদ্বাণী তুলে ধরেন এবং সেগুলো পূর্ণ হবার প্রমাণ উপস্থাপন করেন। মসীহ মাওউদ (আ.) তাঁর সত্যতা সম্পর্কে 'তোহফায়ে গোলড়াবিয়া' পুস্তকে বলেন, "আমি সেই বৃক্ষ যাকে আল্লাহ তা'লা নিজ হাতে রোপণ করেছেন। তাই এই বৃক্ষ কোনভাবেই নষ্ট হবার নয়।"

জলসার এই অধিবেশনের শেষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী জনাব রাশেদ খান মেনন তার শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, আমরা জানি আপনারা আপনাদের মত প্রকাশ, ধর্মচর্চা করতে গিয়ে নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন যা কোনভাবেই কাম্য নয়। এহেন পরিস্থিতিতে আমরা আপনাদের সাথে আছি, ছিলাম এবং থাকব ইনশাল্লাহ।

অতঃপর কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে।

৫ম অধিবেশনের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মশিউর রহমান সাহেব। এরপর নযম পরিবেশন করেন আলহাজ্ব ইব্রায়েতুল হাসান।

নযম পরিবেশনের পর বক্তৃতা পর্ব শুরু হয়। প্রথম বক্তা ছিলেন মাওলানা জাফর আহমদ। তার বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল **"দোয়াই আমাদের অস্ত্র"**। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "দোয়া আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের শক্তিশালী প্রমাণ। কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে যে খোদা কোথায়? খোদা বলেছেন, তুমি তাকে বলে দাও বান্দা যখন ডাকে তখন আমি তার ডাকে সাড়া দেই। দিব্যদর্শন, স্বপ্ন ও ইলহামের মাধ্যমে বান্দার দোয়া কবুল হয়ে থাকে। দোয়া বড় সম্পদ ও শক্তি। নবীদের সফলতার একমাত্র মাধ্যম দোয়া। মহানবী (সা.) বলেছেন, "যদি জুতার ফিতাও দরকার হয় তবে তা খোদার কাছে

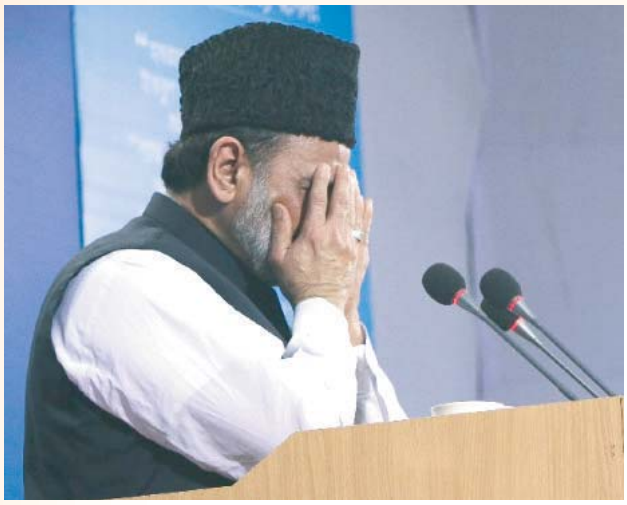

চাও।" এরপর তিনি খলীফার জন্য দোয়া করার জন্য বলেন কেননা খলীফা আমাদের জন্য দোয়া করে থাকেন। মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "দোয়া সেই অস্ত্র যা এ যুগে বিজয় লাভের জন্য আমাকে দেয়া হয়েছে।"

এরপর শুভেচ্ছা বক্তৃতা প্রদান করেন ওয়ার্ড কমিশনার জনাব উমর ইবনে আব্দাল আযীয। এরপর বক্তৃতা প্রদান করেন মোহতরম মাওলানা কামাল ইউসুফ সাহেব। তার বক্তৃতার বিষয় ছিল **"প্রাথমিক যুগে আহমদী মুবাল্লেগদের ইমানোদ্দীপক ঘটনা"**। তিনি তার বক্তৃতায় বলেন, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) তার পুস্তক 'জরুরতুল ইমাম'-এ বলেন, "যে ব্যক্তি ইলহাম পাবার যোগ্যতা রাখে তার উপর ইলহাম হওয়া শুরু হয় । আর যে ব্যক্তি ধর্মের পক্ষে বহাস করেন আল্লাহতালা তাকে জ্ঞান ও অকাট্য যুক্তি প্রদান করেন। এরপর তিনি বিভিন্ন নিদর্শনমুলক ঈমান উদ্দীপক ঘটনা তুলে ধরেন।

অতঃপর শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন বাংলার কৃতি সন্তান এডভোকেট মুজিবুর রহমান সাহেব। এরপর বক্তব্য প্রদান করেন **মোহতরম ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্ব মোবাশশেরউর রহমান** সাহেব। তিনি বলেন, আল্লাহর অশেষ ফজলে আমরা জলসার শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছি। আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল। এখানে সর্বোচ্চ তিন হাজার লোকের জমায়েত হতে পারে। কিন্তু গতকাল পর্যন্ত উপস্থিতি সাত হাজার ছাড়িয়ে গেছে। আমাদের খুব কষ্ট হয় যখন আমরা আমাদের মেহমানদের বারান্দায়, সিড়িঁতে ঘুমাতে দেখি। আমরা তাদের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। এরপর তিনি আমাদের আনসার, খোদ্দাম ও লাজনা অঙ্গ-সংগঠনের কর্মীদের শুকরিয়া প্রদান করেন কেননা তারা অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে তাদের ডিউটি পালন করেছেন। এক পর্যায়ে তিনি বলেন, **বর্তমান যুগে সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ এবং নিজেকে শুধরানো**। অতঃপর তিনি বলেন, হুযুরের প্রতিনিধি আমাদের পঞ্চগড়ের মত বড় জায়গায় জলসা করার জন্য সাহস দিয়েছেন। **আগামী বছর আহমদনগরে জলসার আয়োজন করা হবে ইনশাল্লাহ। অতঃপর তিনি সম্প্রতি রোহিঙ্গা শরনার্থীদের জন্য আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেন**। অতঃপর তিনি জামাতের সকলের জন্য দোয়ার আবেদন করে তার মূল্যবান বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

এ বক্তৃতার মাধ্যমেই ৫ম অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে।

হুযূর আকদাসের সম্মানিত প্রতিনিধি সৈয়দ মাহমুদ আহমদ শাহ সাহেবের সভাপতিত্বে সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয়। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা নাসের আহমদ। এরপর নযম পরিবেশন করেন এহসানুল হাবিব জয় ও জনাব তাঈদ আলম সাহেব।

সমাপনী বক্তৃতা প্রদান করেন হুযুর (আই.) এর সম্মানিত প্রতিনিধি মাওলানা সৈয়দ মাহমুদ আহমদ শাহ সাহেব। তিনি বলেন, আমরা প্রত্যেক জুমুআর দিনে এই আদেশ শুনি যে, আল্লাহ্ তোমাদের সৎকাজের আদেশ দেন এবং খারাপ কাজ থেকে বারণ করেন। নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, আমার বিশ্বাস কোন ব্যক্তি ১০ দিন একটানা আন্তরিকতার সাথে নামায পড়ে তবে তার হৃদয় আলোকিত হয়ে যায়। আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য হল আল্লাহ তা'লাকে লাভ করা। এজন্য নামায হল একটি বাহন স্বরূপ নামাযের মাঝে যে আনুগত্য তা জামাতী ব্যবস্থাপনার মাঝেও রয়েছে। জামাতের মাঝে যদি কোন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তবে কর্তৃপক্ষকে জানানো উচিত।

হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেন, সঠিক ও পূর্ণ ইবাদাত সেটি যাতে অনেক বেশি দোয়া থাকে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, তোমাদের প্রভু তোমাদের কী পরোয়া করতেন যদি তোমরা দোয়া না করতে। হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি বলেন, যদি তোমরা আল্লাহকে দেখতে চাও তবে নামায কায়েম করো। পরিশেষে তিনি বলেন, এ পৃথিবীতে যত পীর, আওলিয়া অতিবাহিত হয়েছেন তারা সকলেই নামাযের মাধ্যমে এই পদমর্যাদা লাভ করেছেন। তাই আসুন আমরা সকলেই আরো বেশি নামাযের প্রতি মনোযোগী হই।

অতঃপর সম্মিলিত দোয়ার মাধ্যমে এ জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

উক্ত জলসায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সদস্যগণ যোগদান করেছেন। স্থান সংকুলান না হওয়া সত্ত্বেও ধর্মপ্রাণ বন্ধুগণ অনেক কষ্ট সহ্য করে এই তিন দিনের জলসায় অংশগ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তালার ফজলে এ জলসায় মোট উপস্থিতি ছিল ৭২৮০ জন। উক্ত জলসায় ৬৪৯ জন অ-আহমদী মেহমান সত্য যাচাইয়ের জন্য যোগদান করেছেন। তিন দিনের মাঝে দু'দিন তবলীগি প্রশ্নোত্তর সভা হয়েছে যেখানে আগত অ-আহমদী মেহমানগণ নিজেদের প্রশ্ন করেছেন। এই জলসায় মোট ৫৬ জন বয়াত করে আহমদীয়া মুসলিম জামাতে প্রবেশ করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ। এছাড়া বিদেশী মেহমান ছিলেন ১২ জন।উক্ত জলসা এমটিএ বাংলাদেশ কর্তৃক ইউটিউবে সরাসরি সম্প্রচারিত হবার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকেও আহমদীরা জলসা উপভোগ করার সুযোগ পেয়েছেন। তারা এজন্য বিভিন্ন শুভেচ্ছা বক্তব্যও প্রেরণ করেছেন।

উক্ত জলসা আয়োজনে যারা যেভাবে খেদমত করেছেন এবং যারা কষ্ট সহ্য করে উক্ত জলসায় অংশ নিয়েছেন আল্লাহ তালা তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমীন।

(রিপোর্ট: জলসা বুলেটীন, ৯৪তম সালানা জলসা)

গত ৩১ জানুয়ারি ২০১৮ হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম সৈয়দ মাহমুদ আহমদ শাহ্ সাহেব পাকিস্তান থেকে এসেই বিমানবন্দর হতে ৪নং বকশী বাজারস্থ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর কেন্দ্রীয় অফিসে আগমনকালে পথে গুলশান-২ ধানসিড়ি হোটেলে যাত্রা বিরতি নেন এবং মধ্যাহ্নভোজে অংশগ্রহণ করেন। সাথে মোহতরম মোবাশ্‌শের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, মোহতরম মীর মোবাশ্‌শের আলী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, মোহতরম আবুল খায়ের, নায়েব ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ ও মীর মোহাম্মদ আলী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকাসহ কতিপয় বিশিষ্ট মেহমান উপস্থিত ছিলেন। নিম্নে তারই কিছু আলোকচিত্র–

31.01.2018 14

31.01.2018 15:00

31.01.2018

31.01.2018

31.01.2018 15:44

DHANSHIRI
RESTAURANT
31.01.2018 15:50

বিশ্বশান্তি: সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান

হযরত মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

(২৪তম কিস্তি)

আর্থ-সামাজিক শান্তি

(১) সূচনা, (২) অর্থনৈতিক সুবিচার, (৩) সৎকাজে ব্যয়: অনটনের সময়েও, (৪) গরীবদের জন্য ব্যয়, (৫) কৃতজ্ঞতা, (৬) দান ও অনুগ্রহ করার জন্য মানবীয় প্রতিদান নেই, (৭) ভিক্ষাবৃত্তি, (৮) দান বা সদকার দ্রব্যাদি, (৯) দান প্রকাশে এবং গোপনে, (১০) সামাজিক দায়িত্বাবলী, (১১) ব্যয়ের বর্ধিত সীমানা, (১২) প্রাথমিক ইসলাম থেকে একটি দৃষ্টান্ত, (১৩) অপরের সেবা, (১৪) মদ্যপান ও জুয়াখেলা নিষিদ্ধ।

"এবং যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য, এবং তাদের আত্মার দৃঢ়তার জন্য খরচ করে, তাদের দৃষ্টান্ত উচ্চস্থানে অবস্থিত সেই বাগানের অবস্থার ন্যায়, যার ওপরে প্রবল বৃষ্টিপাতা হলে তা দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন করে। এবং যদি তার ওপর প্রবল বৃষ্টিপাত না-ও হয় তাহলে, অল্প বৃষ্টিই যথেষ্ট এবং তোমরা যা কিছু করছ আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।" (আল্ বাকারা, ২:২৬৬)

"মানুষের নিকট কামনার বস্তুগুলির যথা, রমণীগণের, সন্তান-সন্ততির, স্তূপে স্তূপে পুঞ্জীকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যের, চিহ্নিত অশ্বসমূহের, গৃহপালিত পশুপালের এবং শস্যক্ষেত্রের প্রতি আসক্তিকে মনোহর করে দেখানো হয়েছে। এগুলি সব পার্থিব জীবনের ভোগ্যসামগ্রী, কিন্তু আল্লাহ্ তিনি, যাঁর নিকট রয়েছে উত্তম আবাসস্থল।" (আলে ইমরান, ৩:১৫)

সূচনা

ইসলামের দেওয়ার মত উপদেশ আছে সেই সব ক্ষেত্রের জন্যেও যে সব ক্ষেত্রে সমাজ ও অর্থনীতির দিগন্তগুলো পরস্পর মিলিত হয়েছে। এই সমস্ত উপদেশ বা শিক্ষা যদি বাস্তবায়িত হয় তাহলে, আমাদের প্রতিটি সকাল ও সন্ধ্যার গোধূলির আলো অপূর্ব সুন্দরতায় মণ্ডিত হয়ে উঠবে।

অর্থনৈতিক সুবিচার-পুঁজিবাদে, সমাজবাদে এবং ইসলামে

অর্থনৈতিক সুবিচার একটি চমৎকার শ্লোগান। বিষয়টাকে যেহেতু, অন্যান্য সবাইকে বাদ রেখে একচেটিয়া করে নেওয়ার প্রচেষ্টা চালান হয়, সেহেতু এই শ্লোগানটি মুক্ত বাজার অর্থনীতির পুঁজিবাদী সমাজেও যেমন, তেমনি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বৈজ্ঞানিক সামাজিক মতবাদেও সমভাবেই উচ্চারিত হয়ঃ উভয়পক্ষই সুবিচারের কথা বলে। কিন্তু আমি ক্ষমা চেয়ে নিয়ে এই আশঙ্কা করতে বাধ্য হচ্ছি যে, এতে উভয়পক্ষই 'অর্থনৈতিক সুবিচার'-এর সোনালী নীতির প্রতি সুবিচার করতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু, কথা অনেক আছে, পরে বলছি।

নিরংকুশ সুবিচার-এর যে ইসলামী ধারণা বা কনসেপ্ট তা সর্বব্যাপী ও সর্বাত্মক। ইসলামী শিক্ষার সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। তবু এটাও সবটা নয়। ইসলাম আরও এক ধাপ এগিয়ে চলে।

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে অর্থনীতির যমীনটাকে এমন সম্পূর্ণরূপে ও সুন্দররূপে সমান করার চেষ্টা করা হয় যেন উঁচু-নীচু বলতে আর কিছু বাকী না থাকে। পানি সেঁচলে যেন সমস্ত যমীনটাই সমানভাবে সিক্ত হতে পারে। অতএব, গরীবদের তরফ থেকে কোন প্রকার দাবীদাওয়ার প্রশ্ন যেমন নেই, তেমনি

ধনীদেরও কোন ভয় নেই সমাজে কম ভাগ্যবান লোকদের দ্বারা তাদের 'উদ্বৃত্ত সম্পদ' জবরদস্তি লুণ্ঠিত হওয়ার।

পুঁজিবাদী সমাজে কথা আরও বাড়িয়ে বলা হয়ঃ বলা হয় সমান সুবিধার কথা, সকল খেলার জন্যই সমতল মাঠের কথা এবং সম্পদের সম-বিতরণের চাইতে মুক্ত অর্থনীতির কথা। সুতরাং, সেখানে অধিকার আদায়ের জন্য দাবী উত্থাপনের সুযোগ আছে, আছে চাপ-প্রয়োগকারী গোষ্ঠী বা প্রেশার গ্রুপ, যেমন ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতি গঠনেরও অবকাশ। এরা সরকার বা পুঁজিপতিদের কাছে দাবী জানায় দাবী জানায় সেই সমস্ত শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য যারা জীবনভর একটা বঞ্চনার বোধ নিয়েই কালাতিপাত করে।

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র যদি তাদের আদর্শ মোতাবেক রূপায়িত হয় তাহলে সমাজের কোন অংশেই কোন দাবী উত্থাপনের প্রয়োজন হবে না; তা সেই সমাজ চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় সম্পদের সম-বন্টনের পক্ষে যথেষ্ট ধনী হোক, কিংবা দরিদ্র হওয়ার কারণে চাহিদা মেটাতে অক্ষম হওয়ার দরুন অভাব-অনটনকেই সকলের মধ্যে সম-বন্টন করে নিক। এইরূপ সমাজ অবশেষে এমন একটা অবস্থায় পর্যবসিত হয়ে যাবে, যখন সেখানে আর দাবী-দাওয়ার পক্ষে কোন অর্থবহ ভূমিকাই থাকবে না পালন করার জন্য।

অপরপক্ষে, পুঁজিবাদী পদ্ধতিটা হচ্ছে দাবী-ভিত্তিক। এক্ষেত্রে, সমাজের কম ভাগ্যবান অংশকে তার অসন্তোষ প্রকাশের অধিকার দিতে হবে এবং শুনানীরও অবাধ সুযোগ দিতে হবে। অতএব, এমনটি হলে তো আর প্রয়োজন পড়বে না কোন প্রেশার গ্রুপ গঠনেরও এবং ধর্মঘট, হরতাল, লক-আউট ইত্যাদিরও।

ইসলাম এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলে, যাতে সরকারগুলোকে এবং বিত্তবানদেরকে বারবার মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে, তাদের নিজেদের স্বার্থেই তাদেরকে একটি সুষম অর্থনৈতিক পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাদেরকে বারবার এই উপদেশও মেনে চলতে বলা হয়েছে যে, তারা যেন অন্যানদের অধিকার অক্ষুন্ন রাখার প্রতি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখে। দুর্বল ও দরিদ্রকে যেন তাদের মৌলিক অর্থনৈতিক অধিকার থেকে কখনোই বঞ্চিত রাখা না হয়। তাদের প্রত্যেকের পেশা পসন্দ করবার স্বাধীনতা, সুযোগ-সুবিধার সমান প্রাপ্যতা, এবং জীবনধারণের মৌলিক সকল চাহিদা পূরণে অধিকার থাকতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবেই মানতিহাসে ইতোমধ্যেই উত্তরণের জন্য সংগ্রামের পথে বহু দুঃখ-বেদনা এবং বিশৃংখলতার সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণেই ইসলামে 'নেওয়ার' বা 'রাখার' চাইতে অধিক জোর দেওয়া হয়েছে 'দেওয়ার' ওপরে। সরকারগুলোকে এবং বিত্তশালীদেরকে সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সমাজে যেন এমন কোন অংশ থেকে না যায়, যারা সুন্দরভাবে বেঁচে থাকবার মৌলিক মানবাধিকারসমূহ থেকে বঞ্চিত। একটি প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্রকে তার প্রয়োজন কি, তা জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং তা পূরণের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে। দুঃখ-যন্ত্রণার আর্তনাদ প্রতিবাদের রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বেই এবং প্রয়োজন বা চাহিদার কারণে শান্তি ও শৃংখলা নষ্ট হওয়ার পূর্বেই দুঃখ-যন্ত্রণার কারণসমূহ দূরীভূত করতে হবে এবং প্রয়োজন সমূহ মেটাতে হবে।

বাহ্যতঃ, এক্ষেত্রে, ইসলামী ও সমাজবাদী সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলো একই রকম মনে হবে। কিন্তু, আসলে, এই সাদৃশ্যটি মাত্র ভাসা-ভাসা। ইসলাম তার লক্ষ্য অর্জন করে ঠিকই, কিন্তু তা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মত জবরদস্তির পন্থায় নয়।

হাতে সময় থাকলে আমি বিষয়টা বিশদভাবে পেশ করতে পারতাম এবং বলতে পারতাম যে, কীভাবে ইসরাম এই মহান লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে। তবু আমরা এতটুকু বলতে পারি যে, এই বিষয়টার ক্ষেত্রে ইসলাম যে পদ্ধতি অবলম্বন করে তা প্রাণহীনও নয়, যান্ত্রিকও নয়; যেমনটা অবলম্বন করে থাকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের দর্শন। বস্তুতঃ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা মানুষের মনস্তাত্ত্বিক গূঢ় নিয়মাবলীর সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অন্য আর সবকিছুর মধ্যে ইসলাম এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করে যেখানে একজনের ব্যক্তিগত অধিকারের দাবী অন্যান্যদেরও অধিকার বিবেচনা করার সুযোগ করে দেয়। নিজ সমাজের লোকদের দুঃখ-কষ্টের প্রতি সচেতনতার এবং অনুভূতি প্রবণতার লেভেল এমন এক স্তরে উন্নীত হয় যখন সামগ্রিকভাবে গোটা সামাজের সকল সদস্যই বেশী উদগ্রীব থাকে একটা ব্যাপারে এবং তা হচ্ছে, সমাজ তাদেরকে যতটা দিচ্ছে তারও চেয়ে বেশী তারা সমাজকে দিতে পারছে কি না।

'শ্রমিককে তার পাওনার চেয়ে বেশী দাও'- এই নির্দেশ বারংবার দিয়ে গেছেন হযরত রসূলে পাক (সা.) তাঁর সাহাবীদেরকে (রা.), তাঁর অনুসারীদেরকে। 'শ্রমিককে তার শরীরের ঘাম শুকাবার আগেই তার পাওনা মিটিয়ে দাও। যারা তোমাদের অধীনে কাজ করে তাদের ওপরে এমন কাজের বোঝা চাপিও না যা তোমরা নিজেরা বইতে পারবে না। তযদূর সম্ভব, তোমাদের ভৃত্যদেরকে তা-ই খেতে দাও যা তোমরা তোমাদের পরিবারকে খাওয়াও। তাদেরকে একই পোষাক পরতে দাও। কোনক্রমেই ভদ্রতা ও শালীনতা সীমা লংঘন করো না। অন্যথায়, তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র সমীপে জবাবদিহি হতে হবে। তোমরা পাছে মিথ্যা গর্বে গর্বিত হও, এজন্যে ভৃত্যদেরকে নিয়ে এই টেবিলে বসো এবং এক সাথে খানাপিনা কর।' (হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থাবলী থেকে)।

সৎকাজে ব্যয়ঃ অনটনের সময়েও

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানবীয় মর্যাদাকে সমুন্নত রাখার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে অত্যন্ত জোরালো ভাষায়। গরীবদের চাহিদার নির্ধারিত নীতিমালার কথ এবং তা কী করে বাস্তবায়িত করতে হবে,

তারও কথা বলা হয়েছে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে:

"যারা খরচ করে স্বচ্ছলতায় এবং অস্বচ্ছলতায়ও, এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি মার্জনাশীল; বস্তুতঃ আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন।" (আলে ইমরান, ৩:১৩৫)

গরীবদের জন্য ব্যয়

ভিক্ষার ধারণাটা সাধারণভাবে দুনিয়ার সবাই বুঝে থাকেন তা দুধারি। এতে একদিকে যেমন, ভিক্ষাদাতার মহৎ গুণের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয়, তেমনি অপরদিকে, ভিক্ষাগ্রহীতার একটা অমর্যাদাকার না হলেও, বিব্রতকর চেহারা ফুটে ওঠে। কেননা, ভিক্ষাগ্রহণটাই তার মর্যাদাকে হেয় প্রতিপন্ন করে। ইসলাম এই কনসেপ্ট বা ধারণার একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে।

কেন যে কিছু লোক গরীব এবং কিছু লোক ধনী, তার একটা আকর্ষণীয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে কুরআন করীমের এই আয়াতে:

"বস্তুতঃ, তাদের ধন-সম্পদের মধ্যে (একটা অংশের ওপরে) অধিকার রয়েছে তাদেরও যারা সাহায্য প্রার্থনা করে (ভিক্ষুকরা) এবং তাদেরও যারা প্রার্থনা করতে পারে না (গরীবরা)।" (আয্ যারিয়াত, ৫১:২০)

এই আয়াতের অনুধাবনে যে বিষয়টা, সাধারণতঃ, এড়িয়ে যাওয়া হয়, তা হচ্ছে 'হক্' (আক্ষ. অধিকার) শব্দটির প্রয়োগ সম্পর্কিত। এই শব্দটি দ্বারা এখানে একই সঙ্গে ভিক্ষাদাতা ও ভিক্ষাগ্রহীতা– উভয়েরই দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে বহু কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। দাতাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, সে গরীবকে যা দান করছে, তা আসলে, তার নিজের মালিকানাভুক্ত নয়।

যে কোনও অর্থনীতির পক্ষে এটা নিতান্ত অন্যায় যে, সেখানে কছিু লোককে নিঃস্ব অবস্থায় পরিত্যাগ করা হবে, এবং তারা তাদের জীবিকার জন্য বাধ্য হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করবে। একটা সুস্থ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কেউ নিঃস্ব থাকতে পারে না, বেঁচে থাকার তাগিদে ভিক্ষার জন্য হাত পাততে পারে না। ভিক্ষা গ্রহীতাকেও ই বানী শোনানো হচ্ছে যে, তার পক্ষে বিব্রত বোধ করার কিছু নেই।, কিংবা হীন-মন্যতায় ভোগারও কিছু নেই। কেননা, প্রকৃত প্রস্তাবে, আল্লাহ্ই তাকে সুন্দরভাবে ও সসম্মানে বেঁচে থাকবার মৌলিক অধিকার দিয়েছেন। অতএব, দৃশ্যতঃ, দাতা তোমাকে যা কিছু দান করছে তার মধ্যে তোমার নিজেরও অধিকার বা মালিকানা আছে, যদিও তা কোন না কোনভাবে স্থানান্তরিত হয়ে গেছে দাতার হাতে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র শিক্ষা সরাসরি মানব-প্রকৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। কখনও কোন নির্দেশের ভারসাম্য যদি কোন কারণে নষ্ট হয়ে যায় তবে, সংশোধনী ব্যবস্থা গ্রহণ করে তার প্রতিবিধান করতে হবে।

কৃতজ্ঞতা

ওপরে যে বিষয়টি আলোচিত হলো, তার মধ্যে অবশ্য, এই আশঙ্কা নিহিত রয়েছে যে, এতে করে কিছু লোক তাদের উপকারীদের প্রতি অকৃতজ্ঞ থাকতে পারে। তারা অন্যদের কাছ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ কিছু লাভ করে তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে এই বলে বিষয়টি চুকে ফেলতে চাইবে যে, আমাদেরকে যা কিছু দান করা হয়, তা তো আমাদেরই অধীকারভুক্ত। কাজেই, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার কোনও দরকার নেই আমাদের। এই মনোভাবটা যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে তাতে শিষ্টাচার ও শালীন আচরণ নষ্ট হয়ে যাবে।

দানপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি তাকিয়ে পবিত্র কুরআন বার বার তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, সে যেন কৃতজ্ঞ থাকে, এবং সে যেন তার প্রতি সামান্যতম কৃপার জনেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এটা তার কর্তব্য। মু'মিনদেরকে বার বার বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ অকৃতজ্ঞদেরকে ভালবাসেন না। যেমন,

"যদি তোমরা অকৃতজ্ঞতা কর তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের আদৌ মুখাপেক্ষী নন, এবং তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য অকৃতজ্ঞতাকে পসন্দ করেন না। যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর তাহলে তিনি তা তোমাদের জন্য পসন্দ করেন। এবং কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না। অতঃপর তোমাদের প্রতিপালকের দিকে তোমদের প্রত্যাবর্তন ঘটবে, তখন তিনি তোমাদেরকে তোমরা যা করতে সে সম্পর্কে অবহিত করবেন। নিশ্চয় তিনি তোমাদের বক্ষঃস্থলে নিহিত সব বিষয় সম্বন্ধে সম্যক অবগত।" (আল্ যুমার, ৩৯:৮)

কৃতজ্ঞ আচরণের প্রতি জোর দিতে গিয়ে ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা রসূলে করীম (সা.) মু'মিনদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন:

"যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, সে আল্লাহ্র প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়।"

এইকথাটির ভিতরের কথা হচ্ছেঃ কোন ব্যক্তি যদি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ না হয় তাহলে, সে খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ হলেও খোদা তার কৃতজ্ঞতা কবুল করবেন না। সুতরাং, শালীনতা, শিষ্টাচার, সৌজন্য এবং কৃতজ্ঞতাকে পবিত্র কুরআনের বাণীতে নিরুৎসাহিত করা হয় নি। এ কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে পূর্বোক্ত আয়াতে- (৩৯ঃ৮)। এটাতো দান গ্রহিতার প্রতি একটি যথোপযুক্ত উপদেশ বাণী যে, সে যেন দান গ্রহণ করার কারণে কোন প্রকার হীনমন্যতায় না ভুগে কিংবা তার সম্মানহানী ঘটেছে বলে মনোক্ষুন্ন না হয়। এখানে যা বলা হয়েছে, তা হচ্ছেঃ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাটা মানুষের জন্য সম্মানহানীকর কিছু নয়, বরং এতে সম্মান বৃদ্ধিই পায়। দাতাদেরকে লক্ষ্য করে ইসলাম একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলেছে। মনে করা হয় যে, কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য হলেও তা গ্রহণ করাটা মর্যাদা ও ভদ্রতার পরিপন্থী। এই

মনোভাবটা ইদানিং সভ্য আচরণের একটা অংশ বলে বিবেচিত হচ্ছে পৃথিবীর সর্বত্রই। কিন্তু, এই সার্বজনীন আচরণবোধটার সঙ্গে ইসলামী মহৎ আচরণের শিক্ষার একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ইসলাম দাতব্য ব্যক্তিকে এই নির্দেশ দান করে যে, সে যেন শুধু তার স্বভাজ প্রবৃত্তির তাগিদে বা সুনাম অর্জনের খাতিরে দানশীলতা না দেখায়, বরং সে যেন দান করে আরও বেশী উন্নত ও মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। ইসলাম মানুষকে বার বার স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সে যেন শুদু আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সৎকাজ করে, সে যেন সৎকাজ করে শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাঁর কৃপাভাজন হওয়ার উদ্দেশ্য।

এথেকে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় যে, যখন কোন খাঁটি মুসলমান প্রয়োজনে কোন কিছু দান করে, তখন সে আসলে তা করে, না তার নিজের খাতিরে, না অন্য কারো খাতিরে বরং সে তা করে তার স্রষ্টাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে, যে স্রষ্টাই মূলতঃ তাকে দান করেছেন তার সব কিছুই। এই নীতির আলোকে দেখলে দেখা যাবে যে, সে অন্যদের জন্যে যা কিছু খরচ করে, তা সে করে তার প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্য, অপরের প্রতি কৃপা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নয়। এই অতি মহীয়ান দৃষ্টিভঙ্গীর শিকড় প্রোথিত রয়েছে কুরআন করীমের একটি প্রাথমিক আয়াতে। এই আয়াত মু'মিনদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়ঃ

"এবং আমরা তাদেরকে যে রিয্‌ক দান করেছি তা থেকে (তারা) খরচ করে (আমাদের পথে)।" (আল্ বাকারা ২ঃ ৪)

সুতরাং, শুধু সৌজন্য প্রদর্শনের খাতিরেই কোন খাঁটি মু'মিন কৃতজ্ঞতা প্রত্যাখ্যান করে না, বরং এটা সে সত্যিসত্যিই বিশ্বাস করে যে, গ্রহীতা যদি তার গৃহীত দানের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চায়, তবে তা তার করা উচিত একমাত্র খোদা তা'লার কাছে, অন্যের কাছে নয়। খাঁটি মু'মিন যারা ঈমানের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করে, তারা দারুণ বিব্রত বোধ করে যখন তাদের দানের জন্য ধন্যবাদ জানানো হয়। পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেঃ

"এবং তারা তাঁরই প্রেমে মিসকীন, এতীম এবং বন্দীকে আহার করায়, (এবং তাদেরকে বলে) আমরা তোমাদেরকে কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আহার করাই, আমরা তোমাদের নিকট প্রতিদান চাই না এবং কোন কৃতজ্ঞতাও না।" (অদ্ দাহর- ৭৬ঃ৯,১০)

মানুষকে শুধু আহার করানোটাই যথেষ্ট নয়। বরং তাদেরকে আহার করানো উচিত এই উপলব্ধি থেকে যে, তোমরা যারা আহার করাও তারা নিজেরও ক্ষুধা-তৃষ্ণার যন্ত্রণা যে কী, তা বুঝ, এবং তোমরাও তাদের সেই কষ্টেরই অংশীদার; এবং সে কারণেই তোমরা না কোন প্রতিদানের আশা রাখ, না কোন ধন্যবাদের।

এই আয়াতের সৌন্দর্য তো চোখ-ঝলসানো। মু'মিনদেরতে যদি শুধু এতটুকুই শেখানো হতো যে, তারা যেন কৃতজ্ঞতা প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে একটা বাহ্যিক সদয় ও সুপ্রসন্ন দৃষ্টিভঙ্গী প্রদর্শন করে এবং বিনয়ী মানুষের মত ব্যবহার করে, তাহলে তো সেক্ষেত্রে ভণ্ডামী বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা থেকে যেত। কেননা, আমরা যখন বলি 'না' না, ধন্যবাদের দরকার নেই' তখনও বস্তুতঃ, এ ব্যাপারে আমরা সচেতন থাকি যে, এতে করে আমাদের ভাবমূর্তি দান গ্রহীতার কাছে বৃদ্ধিই পাচ্ছে।

ইসলামের শিক্ষা আরও বেশী মহীয়ান, আরও বেশী গরীয়ান, দাতাকে এই কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, সে তার পণ্য দু'বার দুটো পার্টির কাছে বিক্রী করতে পারে না। কেননা, একটা সৎকাজ, হয় খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা যায়, নয়তো মানুষের শ্রদ্ধাভাজন হওয়ার জন্যে। এই উভয় উদ্দেশ্য, এই আয়াত অনুসারে, একই সঙ্গে সাধিত হতে পারে না।

যখন খোদা তা'লার কোন প্রকৃত বান্দা কোনও অভবাগ্রস্ত ব্যক্তিকে বলে যে,তার দানের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, খোদার সন্তুষ্টি অর্জন: তখন সে তাকে সেই সঙ্গে একথাও স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আল্লাহ্‌ই হচ্ছেন আসল দাতা। ফলে, দান গ্রহীতার মনে কোন হীনমন্যতার সৃষ্টি হলেও তা অপসৃত হয়ে যায়।

(চলবে)

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিক-নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার প্রকাশক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর,
মাহবুব হোসেন
প্রকাশক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

আমাদের খোদা

"দিনে রাতে মোর প্রাণে বাজে সদা এই ভুবনের আছে এক খোদা।"

ডিসেম্বর ১৯৯৮ সালে জলসা সালানায় প্রদত্ত বক্তৃতা

মূল **হাফেয ড. সালেহ মুহাম্মদ আলদীন**

(২য় কিস্তি)

(২) আমাদের খোদা 'এক'

আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় অস্তিত্ব এবং গুণাবলীতে অংশীবিহীন। কুরআন মজিদে আল্লাহ্ তা'লা বলেন : 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ'। অর্থাৎ- তুমি বল! আল্লাহ্ এক। 'আল্লাহুস সামাদ'। অর্থাৎ- তিনি স্বনির্ভরস্থল। সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। আর তিনি কারো মুখপেক্ষী নন। লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইয়ুলাদ'– তিনি কারো পিতা নন, আর কেউ তাঁর পিতা নয়। 'ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহু কুফুয়ান আহাদ'– তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। অর্থাৎ- তাঁর মত মর্যাদাশালী আর কেউই নেই। তাঁর গুণাবলীতেও কেউ তাঁর সমকক্ষ নয়। (সূরা ইখলাস : ২-৫)

"তিনি এক, নাই সমকক্ষ কোনো তাঁর
মালিক তিনি, বিচারক তিনি সবার।
না আছে পিতা তাঁর –না পুত্র কোনো
অনাদি-অনন্ত তিনি, সব সময় জেনো।
না আছে প্রয়োজন কোন স্ত্রীর তাঁর
প্রয়োজন নাই তাঁর সাথী-সমাহার।"

(কালামে মাহমুদ)

আল্লাহ্ এক। এ বিষয়ে কুরআন শরিফ নিম্নোক্ত প্রমাণ দেয় : "লাউ কানা ফিহিমা আলিহাতুন ইল্লাল্লাহু লাফাসাদাতা"। (সূরা আম্বিয়া : ২৩)। অর্থাৎ, তবে দু'টি ব্যবস্থাপনার (বৈপরীত্যের জন্য –অনুবাদক) কারণে আকাশ ও পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত। যদি দুই খোদা থাকতো, তাহলে ভিন্নধর্মী ব্যবস্থাপনা পৃথিবীতে বলবৎ হতে চাইতো। ফলে পৃথিবীর একদিক একদিকে যেতো আর অন্যদিক যেতো অন্যদিকে। কিন্তু এমনটি হয়নি। বিজ্ঞান আমাদের বলে সমস্ত পৃথিবী সৃষ্টিতে একটি নিয়মই দৃষ্টিগোচর হয়। কুরআন মজিদে এই বিষয়ে বারবার তাগিদপূর্ণভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লা-ই আমাদের উপাস্য– অর্থাৎ প্রার্থনার যোগ্য। কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করছি।

সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে– 'শাহিদাল্লাহু আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাহু; ওয়াল মালা-ই-কা-তু ওয়া ওলুল ইলমি কা ই মাম বিল কিস্‌তি। লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল আযিযুল হাকীম'। (সূরা আলে ইমরান : ১৯)

অর্থাৎ- আল্লাহ্ ইনসাফের সাথে এই বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, প্রকৃত বিষয় হলো, তিনি ভিন্ন কোন উপাস্য নাই। ফিরিশ্‌তা এবং জ্ঞানীরা এই সাক্ষ্যই দেয় যে, তিনি ছাড়া কেউ উপাসনার যোগ্য নয়। তিনি মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

'আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়া। লাহুল আসমাউল হুসনা।' (সূরা তাহা : ৯)

অর্থাৎ- আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নাই। সকল সুন্দর নাম তাঁরই।

'কুল ইন্নামা আনা মুনযির। ওয়ামা মিন ইলাহিন ইল্লাল্লাহুল ওয়াহিদুল কাহহার।' (সূরা সাদ : ৬৬)

অর্থাৎ- তুমি বল, 'আমি একজন সতর্ককারী এবং আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তিনি এক-অদ্বিতীয় এবং মহা প্রতাপশালী'।

'আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহুয়া। ওয়া আলাল্লাহি ফাল ইয়াতাওয়াককালিল মু'মিনুন।'

অর্থাৎ- আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। সুতরাং মু'মিনগণের তাঁরই ওপর ভরসা করা উচিত।

(৩) আমাদের খোদা আমাদের প্রভু

আমাদের খোদা আমাদের প্রভু। তিনি আমাদের সৃজনকারী ও উন্নতি দানকারী। সূরা ফাতেহায় সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'লার

প্রতিপালক (রব) গুণের আলোচনা হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি নযিলকৃত প্রথম আয়াতেও আল্লাহ্ তা'লার প্রতিপালক (রব) গুণের কথা বলা হয়েছে। সে আয়াতটি হল :

– পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।
– যিনি মানুষকে জমাট রক্ত হতে সৃষ্টি করেছেন।
– পড়! তোমার রব অনেক দয়াময় এবং সম্মানিত।
– সেই রব! যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষাদান করেছেন এবং ভবিষ্যতেও শিখাবেন।
– তিনি মানুষকে সেসব শিখিয়েছেন যা তারা জানত না। (সূরা আলাক : ২)

আয়াতগুলোতে নিতান্ত ভালবাসার সাথে বলা হয়েছে, আমাদের খোদা– যিনি আমাদের প্রতিপালক (রব)–আমাদেরকে এবং অন্যান্য সব জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই জ্ঞান দান করেন। হযরত ইবরাহিম (আ.) স্বীয় রাব্বুল আলামিন প্রতিপালককে এই প্রেমময় ভাষায় বর্ণনা করেন :

– তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি হেদায়াত দান করেন।
– এবং তিনি আমাকে পানাহার করান।
– এবং আমি যখন অসুস্থ হই তখন তিনি আমায় আরোগ্য দান করেন।
– আর তিনিই আমাকে মৃত্যু দিবেন এবং পুনরুত্থিত করবেন।

আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসায় হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এক কবিতায় বলেন :

"তোমার হাতে প্রাণখানি গেলে
এর চেয়ে বেশি আনন্দ কী আর?
প্রাণ হর মোর তুমি–
আপত্তি নাই কোন আর।"

(কালামে মাহমুদ, ২য় খন্ড, ১৬১ পৃ.
আল-ফযল ১৩ এপ্রিল, ১৯৫২)

মৃত্যুর সাথে-সাথে আমাদের জীবন শেষ হয়ে যায় না বরং আমাদের খোদা আমাদের এক নতুন জীবন দান করেন। কিয়ামতের দিন বিচারকার্য অনুষ্ঠিত হবে। হযরত ইবরাহিম (আ.) বলেন : 'আমি আশা করি সেই সত্তা বিচার দিবসের দিন আমাকে মাফ করে দিবেন।' (সূরা শুয়ারা : ৭৩-৮৭)

কুরআন মজিদে প্রতিপালক (রব) গুণের কথা আলোচিত হয়েছে। কোন-কোন জায়গায় রাব্বি (আমার রব), কোথাও রাব্বানা (আমাদের রব), রাব্বুকা (তোমার রব), রাব্বুকুম (তোমাদের রব) প্রভৃতি ভালবাসাপূর্ণ শব্দ এসেছে। সূরা রহমানের আয়াত– 'তাবারাকাসমু রাব্বিকা যিলজালালি ওয়াল ইকরাম।' (সূরা রহমান : ৭৯) অর্থাৎ- তোমার প্রতিপালকের নাম অতীব বরকতপূর্ণ, যিনি মহাপ্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী।

সূরা ওয়াকেয়ার আয়াত– 'ফাসাববিহ বিসমি রাব্বিকাল আযিম'। (সূরা ওয়াকেয়া : ৭৫)

অর্থাৎ- অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের তসবিহ্ কর।

সূরা আলায় বলা হয়েছে : 'সাব্বি হিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা।

অর্থাৎ- তুমি তোমার মহামহিম প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা কর।

আমরা নামাযের শুরুতে 'সুবহানা রাব্বি আল আযিম'– অর্থাৎ, পবিত্র আমার প্রভু যিনি মহান এবং সিজদায় 'সুবহানা রাব্বি আল আ'লা'– অর্থাৎ, পবিত্র আমার প্রভু যিনি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন– পড়ে থাকি। একইভাবে বারবার 'আমার প্রভু'– বলে নামাযের বিভিন্ন জায়গায় পড়ে আমাদের প্রিয় খোদার সাথে আমাদের ভালবাসার প্রকাশ করে থাকি এবং 'আল আযিম' ও 'আল আ'লা' শব্দের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে থাকি।

(৪) আমাদের খোদা আমাদের বাদশাহ্

আমাদের খোদা আমাদের বাদশাহ্ও বটে। কুরআন মজিদে আল্লাহ্ তা'লা বলেন : 'হুয়াল্লাযি লা ইলাহা ইল্লা হুয়া। আল মালিকুল কুদ্দুসুস সালামুল মু'মিনুল মুহাইমিনুল আযিযুল জাব্বারুল মুতাকাব্বির।" (সূরা হাশর : ২৪)

অর্থাৎ- তিনিই আল্লাহ্, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। যিনি সর্বাধিপতি, অতীব পবিত্র, পরম শান্তিময়, পূর্ণ নিরাপত্তাদাতা, সর্বোত্তম রক্ষাকর্তা, মহাপরাক্রমশালী, প্রবল প্রতিবিধায়ক, অতীব গরীয়ান।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর এক কবিতায় বলেন :

"সর্বশক্তিমান! অসাধ্য সাধনকারী তিনি
না পায় ভেদ কেউ তার, সহজকে কঠিন করেন যিনি।"

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁর কুরআন অনুবাদ ক্লাসে বলেছিলেন :

"আল্লাহ্ তা'লার বর্ণনা এসেছে এভাবে : 'কুলিল্লাহুম্মা মালিকালমুল কি তু'তিলমুলকা মিম-মানতাশা ও ; ওয়া তানজিউল মুলকা মিম্মানতাশাও। ওয়া তুইয্যু মানতাশা-ও ওয়াতু যিল্লু মানতাশা-ও বিইয়াদিকাল খায়ের। ইন্নাকা আলা কুল্লে শাইয়্যিন কাদির। তু'লি জুল্লাইলা-ফিন্নাহারে ওয়া তুলিজুন্নাহারা ফিল লায়ল। ওয়া তুখরিজুল হাইয়্যা মিনাল মাইয়্যেতে ওয়া তুখরিজুল মাইয়্যেতা মিনাল হাইয়্যে। ওয়া তার যুকু মানতাশা'ও বি গাইরি হিসাব।' (সূরা আলে ইমরান : ২৭-২৮)

অর্থাৎ, হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ্! তুমি যাকে চাও রাজত্ব দান কর এবং যার কাছ থেকে চাও রাজত্ব কেড়ে নাও। এবং যাকে চাও সম্মান দান কর আর যাকে চাও লাঞ্ছিত কর। সকল কল্যাণ তোমারই হাতে। নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

তুমি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করাও আর দিবসকে রাত্রিতে। এবং তুমি জীবিতকে মৃত হতে বের কর আর মৃতকে জীবিত হতে। এবং যাকে চাও তুমি বেহিসাব

রিযিক দান কর।

সূরা ইয়াসিন-এ বলা হয়েছে– 'ফাসুবাহানাল্লাযি বিইয়া দিহি মালাকুতু কুল্লি শাইয়িওওয়া ইলাইহি তুরজাউন।' (সূরা ইয়াসিন : ৮৪)

অর্থাৎ- অতএব পবিত্র তিনি, যাঁর হাতে প্রত্যেক বিষয়ের আধিপত্য। এবং তাঁরই দিকে তোমাদের সকলকে প্রত্যাবর্তন করা হবে।

সূরা হাদিদ-এ বলা হয়েছে– 'লাহু মুলকুস সামাওয়াতে ওয়াল আরদ। ওয়া ইলাল্লাহি তুরজাউন ওমুর।' (সূরা হাদীদ : ৬)

অর্থাৎ- আকাশ সমূহের ও পৃথিবীর সত্ত্বাধিকার তাঁরই; বস্তুত আল্লাহ্‌রই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ২২ জানুয়ারি ১৯৯৮ তারিখের জুমুআর খুতবায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন :

"এটা সাধারণভাবে বলা হয়েছে আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহ্ তা'লার। এই রাজত্বে অন্য কারো অংশীদারিত্ব নেই। এই সত্যটি হৃদয়ে গেঁথে নেয়ার নামই তৌহিদ।"

"... শুধুমাত্র রাজত্বই নয় বরং সমস্ত বিষয়াবলী, সমস্ত কথা তাঁর দিকে (বিচারের জন্য – অনুবাদক) প্রত্যাবর্তিত হবে। তাঁর থেকে পালানোর সুযোগ নেই। আল্লাহ্ তা'লার রাজত্ব কোন দুনিয়াবী রাজত্বের মত নয়, যেখান থেকে পলায়ন করে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিবেন; দুনিয়াতেও তার কোন আশ্রয় নেই। আর আকাশেও না। আর যদি হতো-ও তবুও তার দিকে ফিরে যেতে হতো। পৃথিবীতে কখনো আল্লাহ্ তা'লার তকদির প্রকাশে বিলম্ব ঘটে। কিন্তু আঁ-হযরত (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ তা'লা নিশ্চয়তা দান করেছেন: দেখ! তোমার বিরুদ্ধবাদীদেরকে এই জগতে ধৃত করা না হয়, তবে তুমি জান যে, এদের অবশেষে ধরা হবে। আঁ-হযরত (সা.)কে উদ্দেশ্য করে এই কথায় মূলত আমাদের জন্য এক গভীর প্রজ্ঞা নিহিত। এই বিষয়ে আঁ-হযরত (সা.)-এর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। বিন্দু পরিমাণও সন্দেহ ছিল না, কেননা তিনি সম্পূর্ণরূপে আখেরাতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর জন্য ইহ জগতে বা পরজগতে কোন প্রকারের ধৃত করা শুধুমাত্র একটি আনুষ্ঠানিকতা ছিল। না হলে প্রকৃত বিষয় হচ্ছে, তাঁর জন্য ইহ বা পরজগতে কোন পার্থক্য ছিল না। আর দৃঢ় বিশ্বাসের পর শত্রুদের হাসি-ঠাট্টা তাঁর কাছে কোন বিষয়ই ছিল না। আল্লাহ্ তা'লা বলেন: অবশেষে সবকিছুই তাঁর দিকে ফিরে যাবে। এতে ঘাবড়াবার কী আছে? এই পরিপূর্ণ ভরসা আমি জামাতের কাছে প্রত্যাশা করি এবং যথাসম্ভব চেষ্টা করি যেন আমার জীবন এই বিশ্বাসে অতিবাহিত হয়। খোদার প্রতি বিন্দু পরিমাণও কোন প্রকারের আপত্তি হৃদয়ে স্থান পাওয়া উচিত নয়। অসুস্থতায়, বিপদে, শত্রুদের ঠাট্টা অথবা শত্রুদের পক্ষ থেকে জীবননাশের হুমকি-ই হোক না কেন– যদি এটি আপনার ধর্ম হয়, যা এই আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে, তাহলে আপনি সর্বদা শান্তির সাথে থাকতে পারবেন এবং মৃত্যুর সময়ও আপনার হৃদয়ে এমন এক শান্তি পাবেন, যা অন্য কোনভাবে সম্ভব নয়।"

(চলবে)

(জুমুআর খুতবা, ৬/১/১৯৮৮ বদর ২২/১০/১৯৮৮)

ভাবানুবাদ: **মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়**

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org
www.mta.tv

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর–৭৮)

হযরত ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য

(১) পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আগমনের উদ্দেশ্যাবলী: সর্বপ্রথমে নীতিগত বিষয়গুলো উল্লেখ করা প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের সূরা জু'মুয়ায় (৩ ও ৪ আয়াতে) হযরত রসূলে আকরাম মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের দুটি পর্যায়ের উল্লেখ করেছেন: একটি ইসলামের প্রথম যুগে এবং অন্যটি আখেরীনদের মধ্যে অর্থাৎ আখেরী যুগে ইসলামের পূর্ণ প্রচারের জন্য। আখেরী যুগে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 'বুরুজ' বা 'যিল' (প্রতিবিম্ব) হিসেবে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব হওয়ার মাধ্যমে রূপকভাবে সূরা জুমুআর বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে। (এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বুখারী হাদীসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীতে যে মহাপুরুষের আগমনের উল্লেখ রয়েছে তাঁকে অন্যান্য হাদীসে প্রতিশ্রুত মাহদী ও মসীহ রূপে অভিহিত করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে পরবর্তিতে ব্যাখ্যাসহ প্রমাণ উল্লেখ করা হবে।) আখেরীনদের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সশরীরে পুনরায় আবির্ভাব বা পুনর্জন্ম হওয়া ইসলামের মৌলিক নীতির পরিপন্থী। উক্ত সূরায় হযরত রসূল করীম মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের যে চারটি প্রধান উদ্দেশ্যের উল্লেখ রয়েছে, সেগুলি তাঁর আবির্ভাবের উভয় পর্যায়ের জন্যই প্রযোজ্য। ফলতঃ আখেরী–যুগে ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পূর্ণরূপে প্রচারের জন্য হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ) আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর আবির্ভাবের চারটি মূল উদ্দেশ্য হলো:

(ক) আল্লাহতা'লার নিদর্শনাবলী (আয়াত) বর্ণনা করা এবং বিশ্বব্যাপী প্রচার করা।

(খ) অনুসারীদিগকে পবিত্র আখলাক, পরিশুদ্ধ ও সুসভ্যজাতি (ইউযাক্কিহিম) হিসেবে গড়ে তোলা।

(গ) পবিত্র কুরআনের শিক্ষাদানের জন্য (ইউয়াল্লেহুমুল কিতাব) সময়োপযোগী ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

(ঘ) পবিত্র কুরআনের অন্তর্নিহিত জ্ঞানের (হিকমত) শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা এবং এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলোকে বিশ্বশান্তি নিশ্চিত করা এবং সেই সংগে পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানকে মানব কল্যাণের পথে পরিচালিত করা।

(২) বিশেষ কতকগুলো কার্যাবলী সম্পর্কে: পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত নীতিগত বিষয়গুলোর প্রেক্ষিতে কতকগুলো বিশেষ কার্য সম্পাদনের জন্য আখেরী যুগে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) দাবী পেশ করেছেন। এই সকল কার্য সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কতকগুলো হাদীসের বর্ণনা–

"তোমাদের মধ্যে ইবনে মরিয়ম আবির্ভূত হবেন মীমাংসাকারী ন্যায়–বিচারক হিসেবে অতঃপর তিনি ক্রুশ ধ্বংশ করবেন, শুকর বধ করবেন এবং যিযিয়া রহিত করবেন... তোমরা কত সৌভাগ্যশালী হবে, যখন তোমাদের মধ্যে ইবনে মরিয়ম আবির্ভূত হবেন এবং তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের ইমাম হবেন।" (বুখারী শরীফ: অধ্যায় নযুলে ঈসা ইবনে মারইয়াম)। "ইসা ইবনে মরিয়ম ব্যতীত অন্য কোন মাহদী নাই।" (ইবনে মাজা)। 'তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে, তারা দেখতে পাবে ঈসা ইবনে মরিয়মকে ইমাম মাহদী এবং মীমাংসাকারী ন্যায়–বিচারক হিসেবে। তিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন, শুকর বধ করবেন এবং ধর্ম–যুদ্ধ রহিত করবেন।" (মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল: জিলদ-১, পৃ. ৪১১)।

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো ব্যাখ্যা-সাপেক্ষে অবশ্যই সত্য এবং এই বর্ণনাগুলো হতে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আ.) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হবেন এবং তাঁর প্রধান কার্যাবলী হবে– (ক) ইবনে মরিয়ম, ইমাম মাহদী এবং 'ইমামাকুম মিনকুম' হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার দাবী করা (খ) তিনি মীমাংসাকারী ন্যায়-বিচারক হবেন (গ) তিনি 'ক্রুশ' (খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদ) ধ্বংস করবেন (ঘ) 'খিনজির' বা শুকর (নির্লজ্জতা এবং চরিত্রহীনতা) বধ করবেন, এবং (ঙ) তিনি ধর্মীয়–যুদ্ধ রহিত করবেন।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বব্যাপী ইসলামী তালিম, তরবীয়ত ও তবলিগের জন্য সুদূর প্রসারী কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। বিশ্বব্যাপী শান্তিপূর্ণভাবে ঐক্যবদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঐশী সাহায্য-পুষ্ট আহমদীয়া খেলাফত ব্যবস্থার মাধ্যমে এই বিশাল কার্যক্রম সুসংগঠিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে

ইসলামের পূর্ণ প্রচার এবং মহা বিজয় অর্জনের উদ্দেশ্যে।

* হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) 'তবলীগে হক' নামক পুস্তকে বলেছেন: 'তকমীলে হেদায়াত' বা বিধি-ব্যবস্থার পূর্ণতা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রথম আগমনে সর্বতোভাবে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। 'তকমীলে এশায়াতে হেদায়াত' তাঁহার দ্বিতীয় আগমনে পূর্ণ হইবে। পবিত্র কুরআনের সূরা জুমুআর যে আয়াতে 'ওয়া আখারিনা মিনহুম' আসিয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আত্মিক প্রভাবে আর একটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইবে। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, 'বুরুজী রঙ্গে' হযরত মুহাম্মদ (সা.) আবার আসিবেন। অর্থাৎ তাঁহার আত্মিক শক্তি অন্য কোন মহাপুরুষের মধ্যে দেখা যাইবে। এখন এইরূপই হইয়াছে। বস্তুতঃ বর্তমান যুগই সত্যের পূর্ণ প্রচারের যুগ। ইহার একটি লক্ষণ এই যে, প্রচারের জন্য আবশ্যকীয় যাবতীয় সরঞ্জাম পূর্ণ হইয়াছে। ছাপাখানা, ডাক ও টেলিগ্রামের ব্যবস্থা, রেলগাড়ী, জাহাজ এবং সংবাদপত্র আজ সমস্ত পৃথিবীকে একটি শহরের মত করিয়া দিয়াছে। এই সমুদয়ের উন্নতিতে বস্তুতঃ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতিষ্ঠিত ধর্মের প্রচার সম্ভবপর হইয়াছে।"

(৩) প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী রূপে তাঁর আবির্ভাবের উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ.) নিজে সুস্পষ্টভাবে বিভিন্ন লেখা এবং পুস্তকাবলীর মধ্যে ঘোষণা করেছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ:

* তিনি ঘোষণা করেছেন: "আহমদীয়া জামা'তের উদ্দেশ্য হলো– খোদা ও তাঁর সৃষ্ট জীবের সম্পর্কের মধ্যে যে আবিলতার সৃষ্টি হইয়াছে উহা দূর করতঃ প্রেম ও অনুরাগের সম্পর্ক পুনরায় স্থাপন করা, সত্যের প্রকাশ দ্বারা ধর্মীয় কোন্দলের অবসান করতঃ মিলনের ভিত্তি গড়িয়া তোলা, ধর্মের যেসকল তত্ত্ব লোক-চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে, তাহা পুনঃপ্রকাশ করা, সেই আধ্যাত্মিকতা যা স্বার্থপরতার অন্ধকারের নীচে নিমজ্জিত, তার আদর্শ প্রদর্শন করা, আল্লাহ্ তা'লার যে শক্তিনিচয় মানুষের মধ্যে প্রবেশ করতঃ দোওয়ার মধ্যবর্তিতায় প্রকাশিত হয়, তাহা কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রখিয়া কার্যদ্বারা প্রতিপন্ন করা এবং সর্বোপরি 'শিরক' হইতে মুক্ত, বিশুদ্ধ ও সমুজ্জ্বল তৌহীদ, যাহা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, উহার চিরস্থায়ী চারা রোপন করা। এই সকল কাজ আমার শক্তিদ্বারা নয়, বরং সেই খোদার শক্তিতে সম্পাদিত হইবে, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর খোদা।" (সিয়ালকোটের লেকচার পৃ. ৩৪)।

* তিনি ঘোষণা করেছেন: "আমি ইসলামের ওপর হইতে প্রতিটি আপত্তির পঙ্কিল প্রলেপ অপসারিত করিয়া কুরআন শরীফের উজ্জ্বল মণি-মুক্তা এবং গুপ্ত ধন-ভান্ডার প্রকাশিত করার এবং পৃথিবীর বুকে কোরআন শরীফের সম্মান ও মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আবির্ভূত হইয়াছি।" (মালফুজাত, ১ম খন্ড, পৃ. ৯০)।

*** মুসলিম উলেমা, খৃষ্টান পাদ্রী এবং হিন্দু পন্ডিতগণের প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়ে তিনি ঘোষণা করেছেন:** "এখন আমি পরম শিষ্টাচার ও বিনয়ের সহিত মহামান্য মুসলিম উলামা, খ্রীষ্টান পাদরী এবং হিন্দু পন্ডিতগণের নিকট এই বিজ্ঞাপন পাঠাইতেছি এবং সংবাদ দিতেছি যে, চরিত্র, বিশ্বাস ও ঈমানের দুর্বলতা এবং ভুল–ভ্রান্তি সংশোধনের জন্য আমি প্রেরিত হইয়াছি।... আল্লাহ্ আমাকে জানাইয়াছেন যে, যাবতীয় ধর্মের মধ্যে ইসলামই সত্য। আমাকে জানান হইয়াছে যে, যাবতীয় ধর্ম গ্রন্থের মধ্যে একমাত্র কুরআনের সুশিক্ষাই শুদ্ধতার চূড়ান্ত সীমায় রহিয়াছে ও মানবের হস্তক্ষেপ হইতে পবিত্র। আমাকে আরও জানান হইয়াছে যে, সমস্ত রসুলের মধ্যে পূর্ণ শিক্ষাদাতা এবং স্বীয় জীবন দ্বারা মানবীয় গুণ–গরিমায় শ্রেষ্ঠতম আদর্শ একমাত্র আমাদের প্রভূ হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। খোদা তা'লার পবিত্র ও পরিস্কার ওহী দ্বারা আমাকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে, আমি তাঁহার প্রতিশ্রুত মসীহ এবং অঙ্গীকৃত মাহদী এবং ভিতর বাহিরের মতভেদসমূহ মীমাংসার জন্য সুবিচারক রূপে প্রেরিত হইয়াছি। আমার জন্য মসীহ এবং মাহদী যে দুই নাম রাখা হইয়াছে– এই দুই নাম দ্বারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে পূর্বেই সম্মানিত করিয়াছেন– এই দুই নাম দ্বারা পরে খোদাতা'লা আপন পরিস্কার বাণী দ্বারা আমার এই নামই রাখিয়াছেন। যুগের বর্তমান অবস্থাও অনুমোদন করিতেছে যে, আমার এই নামই হউক।" (আরবাইন, ১ম খণ্ড)।

(৪) ঐশী অনুমোদিত ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা: সূরা নূরঃ ৫৬ আয়াতে খেলাফত প্রতিষ্ঠার ঐশী প্রতিশ্রুতি রয়েছে যা বিশেষভাবে ইসলামের আবির্ভাব যুগে খোলাফায়ে রাশেদীনের মাধ্যমে এবং আখেরী যুগে ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। এ সম্বন্ধে মেশকাত ও অন্যান্য হাদীস দ্রষ্টব্য।

* ইসলামী খেলাফতের নেতৃত্বাধীন আল্লাহতা'লার অনুগ্রহ সিক্ত নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, আল্লাহ্‌র ইবাদত কায়েম করা, শিরকের মুলোৎপাটন করা, অবিশ্বাস ও বিদ্রোহের পরিবর্তে বিশ্বাস ও আজ্ঞানুবর্তিতার শিক্ষা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা।

* ইসলামী নামায ও যাকাত ব্যবস্থা ও বাইতুল মাল প্রতিষ্ঠা এবং কেন্দ্রীয়ভাবে সাংগঠনিক পরিচালনা কার্যক্রম সুপ্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে ঐশী সাহায্য ও করুনা কামনা করা।

* অস্বীকারকারী এবং বিরুদ্ধবাদীদের সর্বপ্রকার বাধা-বিঘ্ন এবং অপচেষ্টা সত্বেও ঐশী পরিকল্পনা অনুযায়ী ঐশী প্রতিশ্রুত নেযাম তথা খেলাফতের অধীনে থেকে ক্রমাগত ধারায় উন্নতি লাভ করা। (সুরা নূর ২৪:৫৬ এর আলোকে)। বর্তমান যুগে আহমদীয়া জামাত ব্যতীত আর কোথাও সত্যিকার অর্থে ঐশী অনুমোদিত খেলাফত নাই।

(৫) "কাসরে সলীব" অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর প্রমাণ এবং আধ্যাত্মিকভাবে ত্রিত্ববাদী ক্রুশীয় মতবাদের ধ্বংস সাধন করার জন্য তিনি অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে কলমের জিহাদ পরিচালনা করেছেন।

(৬) 'দাজ্জাল' ও ইয়াজুজ-মাজুজের মোকাবেলা করার জন্য ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আগমন হয়েছে।

(৭) 'শুকর বধ' এবং 'নিঃশ্বাসে কাফের ধ্বংস' করার জন্য ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের প্রকৃত তাৎপর্য কি তা ব্যাখ্যা করা এবং স্বীয় কার্যাবলী দ্বারা তাঁর সত্যতা প্রমাণ করেছেন।

(৮) ধর্মীয় বিধান ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে অহী (ঐশীবাণী) অবতীর্ণ হওয়ার পথ বন্ধ না হওয়ার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতঃ হযরত আহমদ (আ.) বলেছেন যে, কুরআন শরীফে 'শরীয়াত' বা ধর্ম-বিধান শেষ হয়েছে, কিন্তু অহী (ঐশীবাণী) শেষ হয় নাই। কারণ অহী সত্য-ধর্মের জীবন। যে ধর্মে অহী জারী (প্রচলিত) নাই সে ধর্ম মৃত এবং খোদার সাহায্য থেকে বঞ্চিত ('কিশতিয়ে নূহ' পুস্তক)। তিনি ঘোষণা করেছেনঃ

* "কখনও ইহা মনে করিও না যে, বর্তমানে বা ভবিষ্যতে আর খোদার 'ওহী' (ঐশী-বাণী) অবতীর্ণ হইবে না; যাহা অবতীর্ণ হইবার, তাহা অতীতেই হইয়া গিয়াছে, এবং 'রূহুল কুদ্দুস' পূর্বেই অবতীর্ণ হইয়াছে, বর্তমানে আর অবতীর্ণ হইবে না। আমি তোমাদিগকে সত্য সত্যই বলিতেছি যে, প্রত্যেক দ্বারই বন্ধ হইতে পারে, কিন্তু 'রূহুল কুদ্দুস'-এর অবতীর্ণ হইবার দ্বার কখনও বন্ধ হইতে পারে না।" ('কিশতিয়ে নূহ' পুস্তক)।

* "এটা কখনও সত্য নয় যে, আল্লাহর কথা বলা সম্মুখে নয়, পশ্চাতে রয়ে গেছে। আমরা তাঁর বাক্যালাপ ও সম্বোধনের উপর কোন যামানা বা মেয়াদ নির্দিষ্ট করে মোহর লাগাতে পারি না। নিঃসন্দেহে তিনি পূর্বের ন্যায় এখনও অন্বেষণকারীদের ইলহামের প্রস্রবণ দ্বারা সমৃদ্ধ করতে প্রস্তুত। এখনও তাঁর আশীষসমূহের দরজা তেমনই খোলা আছে যেমন পূর্বেও খোলা ছিল" (ইসলামী নীতি দর্শন)। (পবিত্র কুরআনের ৪১:৩১ এবং ২:১৮৭ দ্রষ্টব্য)।

(৯) বহুদলে উপদলে বিভক্ত মুসলিম উম্মতের মধ্যে একতা ও সংহতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তাঁর আগমনঃ আখেরী যুগে (৭২+১) দলের মধ্যে একটি মাত্র ফিরকাহ সত্য ও মুক্তিপ্রাপ্ত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী আগমনকারী মাহদী ও মসীহের ফিরকার মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে।

(১০) কলমের জিহাদের জন্য 'সুলতানুল কলম' বা 'লেখনী সম্রাট' হিসেবে অস্ত্রের যুদ্ধ রহিত করার উদ্দেশ্যে তাঁর আগমন হয়েছে। 'ইয়াজাউল হারব' অর্থাৎ যুদ্ধ রহিত করণের জন্য অস্ত্রের জিহাদের পরিবর্তে 'কলমের জিহাদ' পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে ইমাম মাহদী ও মসীহের আগমন হয়েছে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত আহমদ (আ.) বলেন-

* "এখন থেকে অস্ত্রের জিহাদের অবসান হলো, কিন্তু নিজের নফস্‌কে পবিত্র করবার জিহাদ বাকী রয়েছে। একথা আমি নিজের তরফ থেকে বলছি না, বরং এটাই খোদার ইচ্ছা। সহীহ বোখারীর সেই হাদীসটি সম্বন্ধে চিন্তা করুন, যেখানে মসীহ মাওউদের পরিচিতিতে লেখা আছে 'ইউযাউল হারব' অর্থাৎ মসীহ (আঃ) যখন আবির্ভূত হবেন, তখন তিনি ধর্মযুদ্ধের অবসান করবেন।" (গবর্নমেন্ট আংরেজি আওর জিহাদ, পৃ. ১৫)।

* "আল্লাহ্ তা'লা এই অধমের নাম রেখেছেন 'সুলতানুল কলম' (লেখনী সম্রাট) এবং আমার কলমকে বলেছেন 'আলীর জুলফিকার' (আলীর তরবারী)। এর মধ্যে এই তাৎপর্যই নিহিত যে, এই যুগ যুদ্ধ-বিগ্রহের যুগ নয়, এ যুগ কলমের যুগ।" (মালফুজাত, ১ম খন্ড)।

* "ইসলামের শত্রুগণকে আমি কোরআন শরীফের অকাট্য যুক্তি-রূপ ধারাল অস্ত্র দ্বারা হেস্তনেস্ত করে দিয়েছি এবং ইসলামের নূরকে কলমের মাধ্যমে প্রদর্শন করে সবাইকে অপরাধী সাব্যস্ত করে লাঞ্ছিতের পর্যায়ে পৌছে দিয়েছি এবং এভাবেই ইসলামের সকল শত্রুর অন্তরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছি।" (দুররে সমীন)

[নোটঃ উল্লেখ্য যে, সংক্ষিপ্ত-সার আকারে বর্ণিত উপরোক্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারে বিরুদ্ধবাদী অপ-প্রচারকারীগণ নানা প্রকার আপত্তি উত্থাপন করে থাকেন। সেই সকল আপত্তি খন্ডনের জন্য বিষয়গুলো পৃথকভাবে উল্লেখ করা হবে।]

অপ-প্রচারকারী আলেমগণের জন্য প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন-

প্রথম প্রশ্ন হলোঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতার দাবীর সত্যতা পরীক্ষার জন্য প্রস্তাবিত পাঁচটি পদ্ধতি সম্পর্কে নীতিগতভাবে কারো কোন আপত্তি আছে কি? প্রথম পদ্ধতি অর্থাৎ তাঁর আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে যে সকল উদ্ধৃতি প্রদান করা হলো সেগুলোর আলোকে ন্যায়-পরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠা এবং সর্বোপরি খোদা-ভীতির কথা সামনে রেখে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর সকল দিক গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখবেন কি? পৃথিবীব্যাপী চতুর্দিকে ক্রমবর্ধমান জঙ্গীবাদী তৎপরতা, চরম মিথ্যাচার এবং কপটতাপূর্ণ কর্মকান্ড দ্বারা অথবা অলীক কেচ্ছা-কাহিনী দ্বারা কোন যুক্তি-জ্ঞান ভিত্তিক এবং শান্তিবাদী ধর্মের চূড়ান্ত বিজয় হতে পারে কি?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলোঃ ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শ্রেষ্ঠতম মোকাম ও মর্যাদা এবং পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বের কথাই বারবার ঘোষণা করা সত্ত্বেও হযরত আহমদ (আ.) সম্পর্কে নানা প্রকার অপবাদ এবং অপ-প্রচারের ছড়াছড়ি কেন? বর্তমান যুগে শতধা বিভক্ত এবং কলহ-কোন্দলে নিমজ্জিত মুসলিম সমাজকে (পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যার প্রায় ২৫ শতাংশ) ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এবং পৃথিবীব্যাপী এক বিশাল জনগোষ্ঠীর (পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যার প্রায় ৭৫ শতাংশ) কাছে ঐশী নির্দেশিত শান্তিপূর্ণ পন্থায় ইসলামের বাণী সঠিকভাবে পৌঁছানোর জন্য ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ) এবং তাঁর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সংগঠন ব্যতীত অন্য কোন দাবীকারক আছেন কি? বিগত শতাধিক বছর থেকে শুরু করে অদ্যাবধি কিছু দাবীকারককে স্বকপোল-কল্পিত পন্থায় চেষ্টা-প্রচেষ্টা করতে দেখা গেছে। কিন্তু তারা সকলেই চরম ব্যর্থতার জটাজালে নিপতিত হওয়া সত্ত্বেও অপ-প্রচারকারীগণের নিদ্রা ভঙ্গ হয় না কেন এবং তাদের কাছে কোন বিকল্প দাবীকারকের অর্থাৎ ইমাম মাহদী ও মসীহরূপে আগমনকারীর নাম-ঠিকানা আছে কি?

বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধর্মীয় পুনর্জাগরণ মূলক আহমদীয়া আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে-যেভাবে এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা আল্লাহতালা কর্তৃক আদেশপ্রাপ্ত হয়ে ঘোষণা করেছেনঃ "এই যুগ হলো মসীহার আগমনের যুগ-অন্য কারো আগমনের জন্য এই যুগ নির্ধারিত হয় নাই। যদি আমি না আসতাম, তাহ'লে অন্য কেহ অবশ্যই আসতো।"

[চলবে]

আমি কিভাবে আহমদী হলাম

মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

(১৪তম কিস্তি)

ভুট্টো ভাট্টি মে

গত সংখ্যায় বা কিস্তিতে একটি খুব জরুরী কথা বাদ পড়ে গেছে। কথা হচ্ছিল, ১৯৭৪ ইং থেকে পাকিস্তানের "পাকিস্তান পিপলস পার্টি" (পি.পি.পি.) সরকার আহমদি জামাতের উপর চরম অত্যাচার চালাতে আরম্ভ করে। তারপরও ১৯৭৬ সনের সাধারণ নির্বাচনে আহমদি জামাত পি.পি.পি. তথা জুলফিকার আলী ভুট্টোকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তখন আহমদিরা খুব কষ্ট অনুভব করে যে, এতকাল যুলুম অত্যাচার সহ্যের পরও আবার ভুট্টোকে ভোট দিতে হবে? আহমদিরা কেউ তো জামাতের সিদ্ধান্তকে অমান্য করে না।

সেসময় মওলানা আব্দুল লতিফ ভাওয়ালপুরী সাহেবের সাথে আমি দেখা করেছিলাম আমার (মাকালা) থিসিস সম্পর্কে কথা বলার ছিল। তিনি শুনিয়েছিলেন তিনি খুব ভগ্ন মর্মাহত হৃদয় নিয়ে দোয়া করছিলেন। তখন তিনি আসমান থেকে দৈব বাণী বা ইলহাম প্রাপ্ত হন 'ভুট্টো ভাট্টি মে' অর্থাৎ জুলফিকার আলী ভুট্টো অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হবে। খুব অল্পকাল পরে বাস্তবে তাই হয়েছিল। যারা আহমদি জামাতের বিরোধীতা করে তাদের পরিণাম খুব খারাপ হয়। ভুট্টোর পরে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান স্বৈরশাসক জেনারেল জিয়াউল হকের পরিণাম কী হয়েছিল তা আপনারা সবাই জানেন। কিন্তু তারপরও দুঃখজনক হলেও সত্য যে ইতিহাস থেকে খুব অল্প সংখ্যক লোক শিক্ষা গ্রহণ করে।

একবার ডাঃ মোবারক আহমদ চৌধুরী সাহেব আমাকে বলেছিলেন,'মজলিস আমেলার মিটিং অথবা যেকোন আলোচনার সময় আমরা আপনাকে এক অর্থে ভয় পেতাম। কারণ আপনি কারো মুখের দিকে লক্ষ রেখে কথা বলতেন না। যা সঠিক মনে করতেন তাই বলতেন। আপনার সহজ সরল স্বভাব আমরা বুঝতাম। আমরা পাঞ্জাবীরা তো মানুষের মুখ রক্ষা করে কথা বলি। কে চৌধুরী সাহেব, কে বড় আর কে ছোট।' আল্লাহ সাক্ষী, আল্লাহ দেখছেন। আমি সব সময় সবাইকে সম্মান করে কথা বলি। কাউকে অবহেলা করি না। কাউকে অতি ভক্তি করি না। কেউ বলতে পারবে না যে, তাকে তাচ্ছিল্য বা অবহেলা করেছি। সবার কথা শুনি। ফলে সবাই আমাকে ভালোবাসেন। যেখানে যেখানে আমি মুরুব্বী হিসেবে কর্মরত ছিলাম সবার সাথে এখনো সম্পর্ক আছে।

১৯৮১ সালের প্রারম্ভে আমাকে ভাওয়ালপুর ছেড়ে গুলগাস্ত কলোনী মুলতানে বদলী করা হল। আমি সেখানে গিয়ে কাজ আরম্ভ করলাম। এখানে এসেই আমার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। খুব শক্ত জন্ডিস হয়ে গেল। বড় মেয়ের বয়স তখন দেড় বছর আর ছোট মেয়ের বয়স তখন তিন মাস। মা-মেয়ে উভয়ে খুব দূর্বল হয়ে পড়েছিল। জামাতের ভাই বোনেরা খুব সাহায্য করেছিলেন। মালেক ফারুক আহমদ খোখর সাহেব স্থানীয়ভাবে নির্মিত ডেজার্ট কুলার আমাদের ঘরে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। আমার স্ত্রী ছয় মাস কামরার বাইরে বের হতে পারেনি। বলা যায়এ রোগের চিকিৎসা নেই। সাবধানতা আর খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ছাড়া কিছু করার থাকে না। পাকিস্তানে এরকম জন্ডিস হয় যে, মানুষ মারাও যায়। পরবর্তী কালে ভাওয়ালপুরের আমীর চৌধুরী গোলাম আহমদ সাহেব এই রোগে দু'বছর ভুগে মারা যান। অথচ তার ভাই ডাঃ মোবারক আহমদ ডাক্তার ছিলেন। কাছেই হাসপাতাল ছিল। কিন্তু চিকিৎসা দিয়ে আরোগ্য লাভ হয়নি। আমাদের জন্য খাদ্য নিয়ন্ত্রণই আসল চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল। তারপর হুযুর (আই.)-এর দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর রহমত আর ফযলের অপেক্ষা ছিল। সাহেবযাদা মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের কাছে একটি ঔষধ ছিল, তিনি আমাকে দিলেন। এটি এক ধরনের পাউডারের মত গুঁড়া যা রোগীকে হাতে রেখে নাকে টেনে নিতে হয়। তাহলে নাক থেকে ঝরঝর করে হলদে রঙের পানি ঝরতে থাকে। সাহেবযাদা সাহেব কে কাদিয়ান থেকে কেউ পাঠিয়েছিলেন। আল্লাহ একান্তই নিজ

বামদিক থেকে মগফুর মুনীব সাহেব– মুরুব্বী সিলসিলাহ,
সাহেবযাদা মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেব– প্রয়াত নাযেরে আলা,
চৌধুরী হামিদুল্লাহ সাহেব– উকিলে আলা, সর্বডানে লেখক

অনুগ্রহে আমার স্ত্রীকে রোগমুক্ত করেছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ।

মুলতানে কাজ শুরু করেছিলাম। এখানে আহমদীরা শিক্ষিত অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। মসজিদের সাথে একটি কামরা বন্ধ পড়েছিল। এটি খুলে এটিকে লাইব্রেরী বানালাম। বসার জায়গা বানালাম যেন কেউ দেখা করতে আসলে বসে কথা বলা যায়। মুরুব্বী কোয়ার্টার থেকে এই কামরায় প্রবেশের জন্য দরজা লাগানো হল।

এখানে একজন চৌধুরী আব্দুল হাই সাহেব থাকতেন। তিনি সুই গ্যাস কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তিনি অনেক চেষ্টা তদবীর করে মুরুব্বী কোয়ার্টারে গ্যাসের Pipeline Connection স্থাপন করিয়ে দিলেন। এভাবে সবাই সহযোগী ছিলেন। এখানকার আমীর সাহেব একজন বড় ডাক্তার ছিলেন। খুব ভদ্র মানুষ ছিলেন।

ডাঃ মুহাম্মদ শফিক শায়গল উচ্চ শিক্ষিত খুব পূণ্যবান মানুষ। Vegetable oil ফ্যাক্টরীর মালিক ছিলেন। তাঁর স্ত্রী আপা নাসিমা লাহোর হাইকোর্টে বিচারপতি মোহতরম শেখ বশির আহমদ (অবসর প্রাপ্ত) লাহোরের আমীরের মেয়ে, খুবই সহজ সরল নেক প্রকৃতির বোন আমাদের খুব খেয়াল রাখতেন। আমার স্ত্রীর অসুস্থতার সময় আমাদের বাসা থেকে ময়লা কাপড় নিয়ে যেতেন এবং তার বাসায় ধুয়ে পরিষ্কার করাতেন। তারপর দিয়ে যেতেন। অনেক সম্মানিত হওয়া সত্ত্বেও কোন অহংকার ছিল না। আল্লাহ তাদের সব সময় সুখে রাখুন।

রাবওয়ায় একজন পাঠান যুবকের (সম্ভবত তার নাম আযীয খান), সাথে দেখা হয়েছিল। লেখাপড়া জানতেন না। একা আহমদী খুবই ধর্মপ্রাণ আর তবলীগের পাগল ছিলেন। কিছু তবলিগী বই পত্র সাথে রাখতেন। সুযোগ পেলেই একজনকে বলতেন ভাই সময় থাকলে এই বইয়ের অত পৃষ্ঠা আমাকে একটু পড়ে শোনাবেন? অনেকে পড়ে শোনাত। আসলে এটাই তার তবলীগের পদ্ধতি ছিল। কিছু পড়ার পরেই তবলিগী কথা-বার্তা শুরু হয়ে যেত। আমার সাথে যোগাযোগ রাখতেন। এখন কোন পাঠান মেয়ে পাওয়া তার জন্য খুবই দুঃসাধ্য ছিল।

এখানে আমাদের বাসার কাছে মোহতরমা শিক্ষিকা আয়েশা সাহেবার বাড়িতে একটি পাঠান মেয়ে ছিল। শিক্ষিকা আয়েশা কোন এতীম খানা থেকে নিজের বাড়ির কাজে তাকে সাহায্য করার জন্য এনে রেখেছিলেন। তখন মেয়ে ছোট ছিল। এখন তো বড় হয়েছে। বিয়ের বয়স হয়েছে। আমার স্ত্রীর অসুখের সময় শিক্ষিকা আয়েশা সাহেবা এই মেয়েকে আমার স্ত্রীর সাহায্যের জন্য ২/৩ ঘন্টার জন্য পাঠাতেন।

আমি একদিন শিক্ষিকা সাহেবাকে এই মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দিলাম আমার ঐ পাঠান বন্ধুর সাথে। শিক্ষিকা সাহেবা পূণ্যবতী মহিলা ছিলেন, আমাদের লাজনার সদর ছিলেন। তিনি রাজি হয়ে গেলেন। আমার ঐ পাঠান বন্ধু আযীয খানকে ডাকলাম যে, বিয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে আসুন। আযীয খান মান্ডি বাহাউদ্দীন জেলায় শাহতাজ সুগার মিলে চাকুরী করতেন। তিনি প্রস্তুত হয়ে আসলেন, মেয়ে দেখলেন, মেয়ে তার খুব পছন্দ হল। মেয়ের অভিভাবকরা যুবকের সাথে কথাবার্তা বলে সন্তুষ্ট হলেন। তারপর তাদের বিয়ে হয়ে গেল।

অনেকপরে, সম্ভবতঃ আমার ঝিলাম শহরে অবস্থানকালে আমি একবার মান্ডি বাহাউদ্দীন তাদের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তাদের সুখের সংসার দেখে আমার খুব ভাল লেগেছিল। সম্ভবতঃ তাদের একটি কন্যা সন্তানও হয়েছিল। তাদের বিয়ে দিতে পেরে আমি একটি ভাল কাজ করেছি বলে মনে হয়েছে।

এখানে কিছু শিক্ষিত আহমদী যুবক ছিলেন যারা মসজিদে আসতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন না। তাদের একজন ডাঃ আব্দুল খালেক সাহেব যিনি ডাঃ ওমর দীন সাহেবের আত্মীয় ছিলেন। ডাঃ ওমর দীন বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন, জীবন উৎসর্গ করে নুসরত জাঁহা স্কীমের অধীনে আফ্রিকায় গিয়েছিলেন, খুবই সফল ডাক্তার ছিলেন। শেষে ফযলে ওমর হাসপাতাল রাবওয়ায় চীফ মেডিক্যাল অফিসার হয়েছিলেন।

ডাঃ খালেক সাহেবকে বললাম, চলেন

রাবওয়া গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.)-এর সাথে দেখা করে আসি। তিনি রাজি হয়ে গেলেন। প্রাইভেট সেক্রেটারীর মাধ্যমে হুযুর (আই.)-এর অনুমতি নিয়ে ৮ সিটের একটি গাড়ি ভাড়া করে ডাঃ খালেক সাহেব ও তার সাথীদের নিয়ে হুযুর (আই.)-এর সাথে দেখা করতে গেলাম।

হুযুর (আই.)-এর সাথে দেখা করে আমাদের খোদ্দামরা খুব খুশী হলেন। তারা ভাবতে পারেন নি যে, হুযুর (আই.) এত ভাল করে ভাল কথা বলবেন। এভাবে হুযুর (আই.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়া একটি খুবই প্রয়োজনীয় কাজ ছিল। হুযুর (আই.) খুশী হয়েছিলেন। কিন্তু পরে জানতে পারলাম আমাদের আমীর সাহেব মরকেযকে লিখেছেন যে, এটি তো আমীর সাহেবের কাজ। মুরুব্বী সাহেবের তো এ কাজ করা উচিৎ না। মোহতরম প্রাইভেট সেক্রেটারী সাহেব আমাকে বললেন, আপনি আর এভাবে সাক্ষাতের আবেদন করবেন না। এ কাজ আমীর সাহেবের জন্য রেখে দিন।

মুলতান সদর হালকার মালেক ফারুক আহমদ খোখর সাহেবের বাসভবনের বাইরে একটি বড় জায়গা খালি ছিল। সেখানে মসজিদ ছিল। মালেক ফারুক সাহেবের পিতা মালেক ওমর আলী খোখর মুলতানের একজন বড় জমিদার ছিলেন। এখানেও আমার যাওয়া আসা ছিল। এখানে চৌধুরী আব্দুশ শুকুর সাহেব হালকা প্রেসিডেন্ট ছিলেন। চৌধুরী আব্দুশ শুকুর সাহেব প্রফেসর ডঃ আব্দুস সালাম সাহেবের ভগ্নিপতি ছিলেন। শুকুর সাহেব হাসি মুখ, মিষ্ট ভাষী ছিলেন। একবার ডঃ আব্দুস সালাম সাহেব কোন কনফারেন্সে করাচী এসেছিলেন। সরকারী ব্যবস্থায় করাচী হতে P. I. A বিমান যোগে মুলতান তাঁর বোনের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। ডঃ সালাম সাহেব অনেক উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর একজন প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক গুলগাস্ত কলোনী মুলতানে বসবাস করতেন। যিনি কিছুদিন পূর্বে মারা গিয়েছিলেন। ডঃ সালাম সাহেব ঐ শিক্ষক সাহেবের পরিবারের সাথে সমবেদনা জানাতে তার বাড়ি গিয়েছিলেন। চৌধুরী শুকুর সাহেব আমাকে খবর পাঠালেন আমি যেন শিক্ষক মরহুমের বাড়ি যাই তাহলে ডঃ সালাম সাহেবের সাথে দেখা করতে পারব। আমি সেখানে গেলাম। ডঃ সালাম সাহেবের সাথে দেখা করলাম। ডঃ সালাম সাহেব খুব অসুস্থ ছিলেন। কিছু খাচ্ছিলেন না। কিন্তু কর্তব্য পালনে পিছপা হননি। আমি বিভিন্ন সময়ে ডঃ সালাম সাহেবের সাথে দেখা করার সুযোগ পেয়েছি। তাঁর উন্নত চারিত্রিক গুণাবলি সম্পর্কে বেশ কিছু প্রবন্ধ পত্র পত্রিকায় পড়েছি। তাঁর পিতা চৌধুরী মোহাম্মদ হোসেন সাহেবের (রাঃ) জানাযায় আমি উপস্থিত ছিলাম। বেহেশতি মাকবেরা রাবওয়ায় দাফনের সময় ডঃ সালাম সাহেবের সাথে দেখা করেছিলাম।

গুলগাস্ত কলোনী মুলতানে বেশি দিন থাকা হয়নি। এখান থেকে আমাকে রাবওয়ায় ফেরত ডেকে পাঠানো হয়েছিল। আমার স্থলে মওলানা আনিসুর রহমান মোবাল্লেগ সাহেবকে পোস্টিং দেয়া হয়েছিল। তিনি লন্ডন থেকে এসে রাবওয়ায় অবস্থান করছিলেন।

রাবওয়ায় এসে প্রথমে কিছুদিন খুব কষ্ট পেয়েছি। মাত্র রাবওয়ায় এসেছি, এখনও কোথাও নিয়োগ প্রাপ্ত হইনি। বাসা পাচ্ছিলাম না। মোহতরম চৌধুরী হামিদুল্লাহ্ সাহেব তখন নাযের জিয়াফত ছিলেন। তিনি যখন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া মারকাজিয়ার সদর ছিলেন তখন থেকে তার সাথে ভাল পরিচয় ছিল। মোহতরম চৌধুরী সাহেব মোহতরম নাযের আলা সাহেবের সাথে কথা বলে মোহতরম মওলানা জালাল উদ্দীন শামস্ সাহেব যে বাসায় থাকতেন সেই বাসায় আমাদের থাকার অনুমতি নিয়েছিলেন। পরবর্তিতে মোহতরম চৌধুরী সাহেব ওয়াকিলে আলা তাহরিকে জাদীদ হিসেবে দায়িত্ব পেলেন। তখন তিনি তাহরিকে জাদীদের কোয়ার্টারে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রহ.) আমার প্রতি বিশেষভাবে সদয় ছিলেন। তিনি নিজ থেকে আমার সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আমাকে যেন হুযুরের কাছাকাছি রাখা হয়।

কিছু মাস পার হয়ে গেল মোহতরম নাযের সাহেব চিন্তা করছিলেন আমাকে নিয়োগ প্রদানের বিষয়ে হুযুরের খেদমতে প্রস্তাব পাঠাবেন। ইতোমধ্যে কিছুদিনের জন্য হুযুর ইসলামাবাদ গেলেন। হঠাৎ হুযুর অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং কয়েকদিনের মধ্যেই ইন্তেকাল করে গেলেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

(চলবে)

আমরা পারি না নাকি করি না

কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

খাকসার লেখার বিষয়টিকে এখান থেকে শুরু করতে চাই। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন, "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা কেন তা বল যা কর না। আল্লাহ্র নিকট এটা খুবই অপছন্দনীয় যে, তোমরা যা বল অথচ তা কর না" (৬১ ঃ ১-৪)। স্মরণ করুন, মহান আল্লাহ্ কিন্তু শুধু কেবল আমাদেরকেই এমনটি বলেছেন। আমরা যারা আহমদী কেবল তাদেরকেই। কারণ আমরা তাঁর (আল্লাহ্) প্রেরিত সত্যে ঈমান এনেছি। অন্যরা যারা ঈমান আনেনি তাদেরকে তিনি বলছেন না। সুতরাং খোদার এহেন আফসোসের জন্য কেবল আমরাই দায়ী। কেননা আমাদেরকে লক্ষ্যজন করেই খোদা এমনটি বলছেন। তাই আমরা এ লেখাটি কেবল আমাদেরকে নিয়েই।

আমরা সর্বত্র সর্বাবস্থায় সর্বক্ষণ সবাই-ই বলি যে, পারি না। আমাকে অন্যেরা সহযোগিতা করে না। আমি করতে চাই কিন্তু অন্যদের আন্তরিকতা পাই না বলে করতে পারি না। সতত ইচ্ছা সত্বেও বিরত থাকি। এমন আস্ফালন আমাদের জন্য অযৌক্তিক। কারণ আমরা প্রত্যেকেই যদি ভাবি যে, আমরা এ কাজটি করছি না অথচ আমাদেরকে তা অবশ্যই করা উচিত তবে কি এখানে 'পরি না' বিষয়টি উপস্থিত থাকার অবকাশ থাকে? জামাতের প্রয়োজনীয় একাজটি যদি আপনিও করেন, সে-ও করে, তিনিও করেন আর আমি করি তবে Ô v i wQbvÕ শব্দটি কোত্থেকে আসে? কেন আসবে? সুতরাং সব কথার সার কথা হলো, "আমরা করি না, পারি তথাপিও করি না"। অথচ খোদার কাছে তা বড়ই ঘৃণিত ব্যাপার। পক্ষান্তরে আমরা নিজেদেরকে খোদার মনোনীত ধর্মের একজন একনিষ্ঠ খাদেম বলে পরিচয় দেই। মূলত এ ক্ষেত্রে সত্য ইহাই যে, আমরা করি না।

আমরা কি তবলীগ করতে পারি না? না, আমরা পারি না। কেননা আমাদের বিদ্যাজ্ঞান নেই। লেখাপড়া জানি না। হাদীস কুরআনের উদ্ধৃতি (Reference) শিখতে পারি না। কাজেই তবলীগ করতে পারি না, তবলীগ করি না। ঠিক আছে। ধরে নিলাম আমাদের বিদ্যা-শিক্ষা নেই, তাই তবলীগ করি না। আমরা কি স্বীয় আমল দ্বারা তবলীগ করতে পারি না? জামাতের সভায় উপস্থিত থাকতে পারি না? নিজেকে নিজে সু-আদর্শ দিয়ে সমাজের অন্যদের মাঝে আমি একজন আহমদী হিসাবে সুপরিচিত হতে পারি না? এমনজন হতে বাধা কোথায়? এমন সুজন হতে অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন কোথায়? তা হলে সিদ্ধান্ত ইহাই দাঁড়ায় যে, আসলে আমরা তা করি না। সর্বান্তকরণে চেষ্টাও করি না।

নামাযের আযান হয়েছে, ঘরে বসে কেন? চা-স্টলে টিভি-এর সামনে কেন? এক্ষণে আমরা কি নামায আদায় লক্ষ্যে মসজিদ অভিমুখে দৌড়াতে পারি না? অন্তত ফযর মাগরিব কিংবা ইশার কালে? তা-ও কি পারি না? অদূরে মসজিদ নেই, ঠিক আছে বাসায়ও কি তা পারি না? কুরআন নাজেরা পড়তে পারি না। শুনতেও কি পারি না? আমার ছেলে অথবা মেয়ে কিংবা আমার স্ত্রী সে-ও কি তা পারে না? তাদের দিয়ে উচ্চ কণ্ঠে কুরআন পড়িয়ে আমি কি তা শুনতেও পারি না? আমি কি কুরআন করীমের ১ম সূরাটিও পড়তে পারি না? তা-ও তো পড়ি না। কেন পড়ি না। মূল কথা আমরা তা পড়ি না তথা করি না। তা হলে পারি না কথাটি ঠিক নয়। আসলে আমরা আলসে। আমরা করি না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "আমার প্রতিটি লেখা তথা সন্দর্ভ সমূহ যে অন্তত ৩ বা পড়েনি তার অন্তরে অহংকারের বীজ রয়েছে"। দিব্যি বলছি, আমরা তা পরি না। অন্যকে দিয়ে তা পড়িয়ে শুনতেও চেষ্টা করি না। রাসূল করীম (সা.) দৈনিক কম করে হলেও ৭০ বার এস্তেগফার পড়তেন। আমরা কি সে নিয়মে তা পড়ি? পড়ি না। আমরা কি তা পারি না? না পড়ি না? তাহলে পারি না বাধাটি কি করে আসল? করি না ইহাই তো সত্য। নবী পাক (সা.) বলেছেন, "তোমরা অন্যের সাথে হাসিমুখে কথা বল। অন্যকে বেশি বেশি সালাম দাও বরং অন্যকে অগ্রে সালাম পৌঁছাও। মোবাইল কানে নিয়ে আগে সালাম দাও পরে কথা বল"। এতটুকুও তো আমরা পারি। কিন্তু করি না। এক্ষেত্রেও আমাদের প্রচন্ড অবহেলা। এগুলিও কি আমরা করতে পারি না? বিনয়ের সাথে ভাব বিনিময় করতে পারি না? পারি কিন্তু করি না। অবহেলা এন্তার। অন্তর খোদার ভয় শূন্য। তাই সেখানে মানব মহব্বতও শূন্য। সুতরাং জামাতের গৌরব ও সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠা বিলম্ব হবেই।

প্রতিবেশীর খবর রাখিনা। জলসা, ইজতেমা কখন হচ্ছে, কোথায় হচ্ছে, কেন হচ্ছে, এক্ষেত্রে আমাদের কি করণীয়, এ খাতের আমার চাঁদা পরিশোধ হলো কিনা, জামাতের নও মোবাইন কে, তিনি কোথায় আছেন, কেমন আছেন, আমার ওয়াকফে নও সন্তানটি কি করছে, আমাকে মুসী হওয়া প্রয়োজন আছে কিনা এর গুরুত্বও বা কতটুকু এর কিছুরই খবর আমি রাখি না। পরন্তু আমরা বড় গলায় বলি, আমরা পারি না। অথচ আমরা এর প্রত্যেকটাই পারি। এসবগুলি না পারার ক্ষেত্রে মোটেই কারো কোন বাধা নেই। প্রকৃতার্থে আমরা তা করি না। আমাদের প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা ভাবে যতটুকু পারার তাগিদ রয়েছে তা যদি প্রত্যেকেই করি তবে নিশ্চয় পারি না শব্দটি থাকবে না। সুতরাং–

পারিব না পারিব না
এ কথাটি বলিওনা আর
কেন পারিবে না তাহা বল বার বার
পাঁচজনে পারে যাহা
তুমিও পারিবে তাহা

তবে আমরা কেন এমন কথা বলব, যা খোদার নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত বিষয়? পরীক্ষায় ফেল করব না যতনা আমাদের কঠিন শপথ তার চেয়েও কঠিন শপথ হওয়া উচিত আমরা কুরআন পাঠ না শিখব না। এমন মনোবৃত্তি হউক আমাদের সবার। পক্ষান্তরে আমরা এমন শপথ করি না, তাই বলি পারি না।

আমাদের খলীফা হুযূর বিশ্বের নেতা। তিনি ২১০টি দেশের আহমদীর জনে জনে খবর রাখছেন। দপ্তরের কাজ করছেন, এমনকি কোন কাজ আছে যে, তিনি বলছেন, "আমি পারি না, পারছিনা কিংবা করব না"? কিন্তু আমরা পদে পদে বলছি, আমরা পারব না। অর্থাৎ করার ইচ্ছা নেই, তাই বলছি পারছি না। সুতরাং বলতে হয় আমরা করি না, তাই পারি না। যদি করি তবে পারবই। আমাদের আরো একটি দৈন্যতা হলো আমরা এই না পারার অপবাদ ঘুচানোর জন্য দোয়াও করছি না। খলীফা হুযূর (আই.) আরো বলেছেন, "আমরা কর্মকর্তাগণ যদি আমাদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করি তবে আমারেদ কাজের ৫০ ভাগ এমনিতেই হয়ে যাবে। বাকী ৫০ ভাগ হবে অন্যদের সবার প্রচেষ্টা ও দোয়ার দ্বারা"। সুতরাং আমরা পারছি না এ কথাটি যেন আর বলব না। কেননা, আমাদের সাথে মহান আল্লাহ্‌র ওয়াদা হলো, "তিনি (আল্লাহ্) কারোর ওপরই তার সাধ্যাতীত কষ্টকর কোন দায়িত্বভার অর্পন করেন না" (২ঃ২৮৭)। যে দায়িত্ব কখনোই আমাদের সাধ্যাতীত নয় যা আল্লাহ্‌র ওয়াদা তা আমরা কিভাবে বলতে পারি, 'আমরা পারছি না'? ইহা হবে গুরুতর অন্যায়। তা হবে খোদার ইচ্ছার বিপরীতে দাঁড়ানোর শামিল। এমনটি ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা।

দিনে যারা অসম্ভব কর্মব্যস্ত তাদের জন্য হয়তবা যোহর থেকে মাগরেব এই তিন বেলার বা-জামাত নামায পড়ার ব্যাপারে সমস্যা থাকতে পারে। বাকী দু-বেলার নামায যথারীতি পড়ার ব্যাপারে তো ছাড় দেয় যায় না। তখন তো শৈথিল্য দেখানো কোনভাবেই যুক্তি সঙ্গত হতে পারে না? অন্তত:পক্ষে প্রতি শুক্রবার জামাতের খেদমতের সময় উৎসর্গ করার ক্ষেত্রে তো কার্পণ্য করা কোন ভাবেই বাঞ্চনীয় হতে পারে না? ৭ দিনের এক দিনও আমরা জামাতকে সময় দিতে পারব না এমনটি বলা কী ন্যায্য কথা? খোদা কি তাঁর ভালবাসার বান্দার নিকট হতে ৭ দিনের ১ দিনও সময় পাওয়ার আশা করতে পারে না? তাহলে আমরা আহমদী কেন? খোদার মনোনীত দলের সদস্য কেন? এমতাবস্থায় খোদার সাথে আমাদের দরদের বন্ধন অটুট রাখার আশা করতে পারি কি করে? ক্রন্দন চিত্তে দোয়া করা, পরম ব্যস্ততায় খোদার কাজে কিছুটা সময় বের করে ব্যয় করার চেষ্টা করা, এমনটি তো আমাদেরকে করতেই হবে। অন্যথায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভাষায় বলতে হয়, "খোদা আমাদেরকে ঘৃণিত বস্তুর ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করে দিবেন" (কিশতিয়ে নূহ)। সুতরাং চলুন প্রত্যেকেই কিছু কিছু না করি। পারি না পারছি না এ কথাটি আর না বলি। আমরা প্রত্যেকে যদি কিছু না কিছু না করি তাহলে যিনি বা যারা জামাতের কর্মকর্তা তারা কিভাবে সব কাজ সম্পন্ন করবেন? এমথাবস্থায় জামাত আগানোর পরিবর্তে বরং পিছিয়েই পড়বে। সম্বলিত প্রচেষ্টা ব্যতীত সার্বিক সফলতা কখনো সম্ভব নয়। তবেই খোদা আমাদের প্রতি অনুকম্পাশীল ও অনুরাগী হবেন।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআনে বলেন, "নিশ্চয় (ইবাদতের উদ্দেশ্যে) রাত্রিকালে উঠা আত্মশক্তির জন্য সর্বাধিক শক্ত পন্থা এবং বাক্যালাপে সর্বাধিক দৃঢ়তাদানকারী। (কেননা) নিশ্চয় দিবসে তুমি দীর্ঘ কর্ম ব্যস্ততায় নিমগ্ন থাক" (৩৭:৭-৮)। খোদা তা'লার উক্তি এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট। দিনে আমরা আমাদের জীবন-জীবিকার তাগিদে প্রচন্ড ব্যস্ত থাকি এবং ইহাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকার ব্যাপারে কোন বাধা নেই। তবে এখানে ব্যস্ত থাকতে যেমন কোন বাধা নেই তেমনি রাতে উঠে নিভৃতে খোদার স্মরণে নিবৃত্ত থাকতেও কোন বাধা নেই। বরং এরূপ নিগূঢ় সাধনায় ব্রত থাকতে জোর তাগিদ রয়েছে। কুরআন করীমের উক্ত আয়াত এমনই সিদ্ধান্ত দেয়। এখানে এসে যদি বলি আমরা দিনে পারি না আর রাতেও পারি না তা হলে বলতে হয় 'পারি না' বলাটা আমাদের মজ্জাগত স্বভাব। করি না এবং করতে চাই না ইহাই পরম সত্য।

বন্ধুগণ! যে কোন উপায়েই হউক, আমাদেরকে করা উচিত এবং করতে হবে এমন স্বভাবের লোকের ইসলামের বর্তমান সময়ে খুবই প্রয়োজন। এখন যদি আমরা বলি 'আমরা পারি না' তবে ইসলামের সমূহ ক্ষতি সাধিত হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কর্মায়োজনে খোদা তা'লা লেসমাত্র অপরাজয় উপস্থিত রাখেন নি বলে ওয়াদা করেছেন। সুতরাং আমাদেরকে পারতেই হবে। আমরা পারব না পারি না একথাটি যেন আর কখনও বলব না।

হে খোদা! তুমি আমাদের সবাইকে সবকিছু করার শক্তি দাও।

কম্পিউটার অপারেটর আবশ্যক

জরুরী ভিত্তিতে ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত দপ্তরের জন্য একজন অভিজ্ঞ কম্পিউটার অপারেটর প্রয়োজন। আগ্রহী প্রার্থীগণকে (আহমদী-নন-আহমদী নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। আলোচনা সাপেক্ষে বেতন নির্ধারণ করা হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা
মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী
ইশায়াত বিভাগ
৪নং বকশী বাজার, ঢাকা
মোবা : ০১৫৫৮৩৬০৪৮০

মুসলিম উম্মাহ্‌র সহমর্মিতায় সহজ-সরল এক নিবেদন

মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্‌

(৩য় কিস্তি)

হযরত ঈসা (যীশু খ্রীষ্ট) আলাইহিস্‌সালাম একজন খোদাপ্রেমী একেশ্বরবাদী সত্যনবী ছিলেনঃ

"আমরা আহমদী মুসলমানরা পাঠকবৃন্দকে অবহিত করতে চাই যে, আমরা হযরত ঈসা (যীশু খ্রীষ্ট) আলাইহিস্‌সালাম-এর উচ্চ মর্যাদা স্বীকার করি এবং বিশ্বাস পোষণ করি যে, প্রকৃতই তিনি খোদার পসন্দনীয় ও মনোনীত একজন সত্য নবী ছিলেন।" (নূর-উল-কুরআন, দ্বিতীয় অংশ, রূহানী খাজায়েন, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৪)

পবিত্র কুরআনের জ্যোতির্ময় মর্যাদাঃ

"আজ পৃথিবীর বুকে সকল ঐশীগ্রন্থের মাঝে পবিত্র কুরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যার ঐশীগ্রন্থ হওয়া সুনিশ্চিত প্রমাণাদির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। মুক্তি-সংক্রান্ত এর নীতিমালা সত্য,সততা ও মানব-প্রকৃতির দাবি সম্মত। এতে বিধৃত বিশ্বাসমালা এত চমৎকার ও সুদৃঢ় যে, সরব ও শক্তিশালী যুক্তিপ্রমাণ, এর সত্যতার সাক্ষ্য বহন করে। এর শিক্ষামালা নিরঙ্কুশ সত্যতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর শিক্ষা সকল প্রকার শিরক বিদাত ও সৃষ্টিপূজার কলুষ হতে পুরোপুরি মুক্ত। এর শিক্ষায় একত্ববাদ ও মহা মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র সম্মান ও সুমহান উৎকর্ষসমূহ প্রকাশের ক্ষেত্রে পরম উচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হয়। এর সৌন্দর্য হলো আল্লাহ্‌র একত্ববাদের প্রমাণ উপস্থাপনের গুণে এটি কানায় কানায় পরিপূর্ণ, এটি পবিত্র সুমহান স্রষ্টার প্রতি কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি, দুর্বলতা ও অযোগ্যতা আরোপ করে না এবং কোন শিক্ষা বা বিশ্বাস একতরফা ভাবে কারো ওপর চাপিয়ে দেয় না, বরং প্রথমে যে শিক্ষা দেয়, এর সত্যতার কারণ বা যুক্তি উপস্থাপন করে আর প্রত্যেক কথা ও উদ্দেশ্যকে যুক্তি ও প্রমাণের নিরিখে প্রতিষ্ঠিত করে। সকল নীতির সত্যতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি উপস্থাপনের মাধ্যমে স্বীয় অনুসারীদের বিশ্বাসে দৃঢ়তা ও তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণতা দান করে। মানুষের কথা-কর্ম ও বিশ্বাসে যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি, অপবিত্রতা ও শূন্যতা এবং বিশৃংখলা বিরাজ করে সেসকল বিপত্তি ও বিশৃংখলাকে প্রদীপ্ত ও সমুজ্জ্বল নিদর্শনের মাধ্যমে দূর করে। আর সেসকল রীতিনীতি শিক্ষা দেয় যা মানুষ হওয়ার জন্য অত্যাবশ্যক। অধিকন্তু প্রত্যেক নৈরাজ্য সেভাবে প্রতিহত করে যতটা ব্যাপকতার সাথে তা আজ সর্বত্র বিরাজমান। এর শিক্ষা অত্যন্ত সহজ-সরল, সুগ্রথিত, সুপ্রোথিত এবং ত্রুটিমুক্ত, যেন প্রকৃতির নিয়মেরই তা প্রতিফলন বা দর্পন আর মানব প্রকৃতিরই প্রতিফলিত চিত্র। অন্তরাত্মাকে আলোকিত করার ক্ষেত্রে তা সূর্য-স্বরূপ আর যুক্তি বা বুদ্ধির অপূর্ণতাকে পূর্ণতাদাতা এবং এর ঘাটতি বিমোচনকারী।" (বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাজায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮১-৮২)

মহানবী (সা.)-এর অতুলনীয় শান ও শ্রেষ্ঠত্বঃ

'পৃথিবীতে পবিত্র-স্বভাবের কোটি কোটি মানুষ অতীত হয়ে গেছেন এবং ভবিষ্যতেও হবেন, কিন্তু আমরা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সর্বাপেক্ষা উন্নত, ও সর্বাপেক্ষা উত্তম সেই মর্দে খোদা বা খোদার সেই পৌরুষদীপ্ত প্রেরীতকে পেয়েছি যার নাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহে আলাইহে ওয়া সাল্লাম।

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٧﴾

[অর্থাৎ- নিশ্চয় আল্লাহ এ নবীর প্রতি রহমত পাঠান এবং তাঁর ফিরিশতারাও (এ নবীর জন্য দোয়া করে)। হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ এবং অনেক সালাম পাঠাও। (আহযাব- ৩৩:৫৭)]

ঐ সকল জাতির পবিত্র পুরুষদের কথা ছেড়ে দাও যাদের কথা কুরআন শরীফে বিস্তারিতভাবে বলা হয় নি। আমরা কেবল তাদের সম্পর্কেই বলছি যাদের উল্লেখ আছে কুরআন শরীফে। যেমন হযরত মুসা, হযরত দাউদ, হযরত ঈসা, (তাঁদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক), এবং অন্যান্য নবীগণ (আ.), আমরা খোদার কসম খেয়ে বলছি যে, যদি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) দুনিয়াতে না আসতেন এবং কুরআন শরীফ নাযেল না হতো এবং ঐ সকল কল্যাণ আমরা স্বচক্ষে না দেখতাম যা আমরা দেখতে পেয়েছি, তাহলে, অতীতের সমস্ত নবীগণের সত্যতা আমাদের কাছে সন্দেহযুক্ত থেকে যেত। কেননা, শুধু কেচ্ছা-কাহিনী থেকে বাস্তব জ্ঞান আহরণ সম্ভব নয় এবং তাদের প্রতি যেসব মোজেজা বা অলৌকিক ঘটনার কথা আরোপ করা হয়, সেগুলিও সব অতিরঞ্জিত। কেননা, সেগুলোর নাম-নিশানাও এখন আর বাকী নেই। বরং ঐ সবই অতীত। আর ঐ কিতাবগুলি থেকে খোদা তা'লার অস্তিত্বেরই কোন সত্যিকার প্রমাণ মিলে না। কারণ, সেগুলো থেকে এই নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে না যে, খোদা মানুষের সাথে কথা বলেন। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পর ঐ সকল কেচ্ছা-কাহিনী বাস্তবতার রঙে রঙিন হতে পেরেছে। এখন আমরা সঠিকভাবেই উপলব্ধি করতে পারি যে, এটা শুধু কথার কথা নয়, বরং এটা বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা যে, খোদা কীভাবে মানুষের সাথে কথা বলেন, কীভাবে খোদার নিদর্শন প্রদর্শিত হয় এবং কীভাবেই বা দোয়া বা প্রার্থনা কবুল হয় এবং এ সমস্ত কিছুই আমরা পেয়েছি মহানবী সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে এবং অন্যান্য জাতির মধ্যে কেচ্ছা-কাহিনীর আকারে যা কিছু বর্ণিত রয়েছে আমরা তা সবই পরখ করতে পেরেছি। অতএব, আমরা এমন এক নবীর আঁচল ধরেছি যিনি **'খোদা-**

নোমা' অর্থাৎ তিনি খোদাকে আমাদের সামনে প্রদর্শিত করে দেখিয়ে দিয়েছেন । (চশমা-ই-মারেফাত, পার্ট -২, রূহানি খাজায়েন, ২৩তম খণ্ড, পৃ. ৩০১-৩০২)

"সব আলেমরা এক রকম নয়। তাদের কতিপয় হলেন খোদাভীরু আর বাকীরা অন্যায়কারী। যারা আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত, আমরা সব সময় তাদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করি; আল্লাহ্ শীঘ্রই তাদের পথ দেখাবেন আর তারা সত্য অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। একব্যক্তি যিনি মসীহ হওয়ার দাবি করেছেন, তাকে 'কাফির' ঘোষণা করা প্রসঙ্গে তাদেরকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, তারা বলে, 'সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ ব্যতিরেকে আমরা কিছু বলব না, কারণ আমরা আল্লাহকে ভয় করি'।" (আল-হুদা, রূহানী খাজায়েন, ১৮তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২০)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.), প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী'র লেখা থেকে চয়নকৃত উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ স্ব-ব্যাখ্যায় সুস্পষ্ট এবং বিশ্বাসযোগ্যতায় এতই দৃঢ়তাপূর্ণ, প্রাঞ্জল, সমৃদ্ধশালী ও নিখুঁত যে, এক অন্তঃপ্রাণ বিশ্বস্ত সৎমানুষের পক্ষে গভীরভাবে প্রভাবিত না হওয়াটাই অস্বাভাবিক। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রকৃত ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে এতটুকু বলেই আমরা আমাদের সম্মাণিত পাঠকবৃন্দের কাছে এ প্রসঙ্গে তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব ছেড়ে দিতে চাই, আর আমাদের আশা ও আল্লাহ্‌র সমীপে বিনীত প্রার্থনা থাকবে যে, তিনি তাদেরকে সত্যের পানে পরিচালিত করবেন।

মুসলিম সাধকগণের বিরুদ্ধে শত্রুতামুলক চরম আচরণ ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই চলে আসছেঃ

আসুন, এবারে বিতর্ক-বিষয়ের ভিন্ন একটি আঙ্গিকের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাক। ইসলামের ইতিহাস পাঠে কেউ এমন আরেকটি উদাহরণ খুঁজে বের করতে পারবে না যে, সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এককভাবে কোন এক মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরোধিতায় একজোট হয়ে সম্মিলিতভাবে বিরূদ্ধ-বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। আর এ দাবী করাটাও সঠিক নয় যে, সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্ একতাবদ্ধ, এমনকি তারা তো মৌলিক ধর্মবিশ্বাস বা মূল আকিদার বেলাতেও একমত নয়। আবার এ ধারনা করাও ভুল যে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার আগে মুসলিম কোন মনীষী এবং তাঁর অনুসারীরা কখনও এই ধরনের অযৌক্তিক শত্রুতামুলক আচরণের সম্মুখীন হয়েছেন, যা আজকাল প্রতিনিয়তই হয়ে চলছে আহমদী মুসলিমরা।

প্রকৃতপক্ষে, ইসলামী ইতিহাসের যেকোন নিরপেক্ষ ছাত্রই দুঃখজনক এ উপসংহার টানতে বাধ্য হবে যে, ইসলামী ইতিহাসের প্রতিটি মোড় বা পর্যায়ে আর প্রত্যেক শতাব্দীতে আলেমরা সমকালীন সৎপ্রকৃতির মনীষীগণের সাথে এতটাই বৈরী ও নিষ্ঠুরতাপূর্ণ আচরণ করেছে, যা পাঠে আজও গা শিউরে ওঠে। আবার এটি এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার যে, নির্যাতনের শিকার এই মহান সাধকগণ নিজ শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পর পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ইসলামের মহাবীররূপে স্বীকৃত হয়েছেন।

শতাব্দীওয়ারী কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে তুলে ধরা হলো–

১ম হিজরী শতাব্দীঃ

খোলাফায়ে রাশেদীন- তৃতীয় ও চতুর্থ খলীফা যথাক্রমে হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.) এবং নবী-দৌহিত্র ইমাম হোসাইন (রা.) প্রমুখগণকে পর্যন্ত সমকালীন বশংবদ পদলেহী চাটুকার আলেমরা ধর্মত্যাগী ধর্মদ্রোহী ইত্যাদী বলে আখ্যায়িত করে অবমানিত করেছে।

২য় হিজরী শতাব্দীঃ

বাগদাদের মহান সুফি-সাধক জুনায়েদ, মোহাম্মদ আল-ফকীহ, ইমাম মালেক বিন আনাস ও ইমাম শাফেঈ, ইসলামী জ্ঞানে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন এই মনীষীগণও সমকালীন আলেমদের ফতওয়ায় কাফের তথা ধর্মত্যাগী, ধর্মভ্রষ্ট, ধর্মদ্রোহী ইত্যাদি বিকৃত খেতাবই পেয়েছিলেন।

ইমাম আবু হানিফাহ, 'হানাফী মাযহাব'এর প্রতিষ্ঠাতাকেও এক ধর্মদ্রোহী কাফেররূপে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। তাকে গ্রেফতার করে কারান্তরালে রেখে নির্যাতন চালানো হয় এবং ধীরে ধীরে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। কারাগারে প্রার্থনারত অবস্থায় তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

৩য় হিজরী শতাব্দীঃ

স্বনামখ্যাত মহান ইমাম বুখারী, মর্যাদায় যার সহীহ বুখারীকে পবিত্র কুরআনের পরেই স্থান দেয়া হয়, তাঁরও বিরুদ্ধে সেকালের ৩,০০০ আলেম তথা মোল্লারা ধর্মভ্রষ্টতার তথাকথিত প্রমাণ উপস্থাপন করে। হাদীস সংকলনকারী মহান এই ইমামকে বুখারা থেকে বহিস্কার করে 'খার্তুং'-এ নির্বাসন দেয়া হয়। সেখানেও তাদের নির্যাতনের কারণে তিনি শান্তিতে থাকতে পারেন নি। আল্লাহ্‌র সমীপে যন্ত্রণা-কাতর অবস্থায় তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করেন। আর শীঘ্রই তিনি তাঁর সৃষ্টিকর্তার সাথে গিয়ে মিলিত হন।

একই শতাব্দীর আরেকজন বিখ্যাত মুসলিম পণ্ডিত ও বিচক্ষণ মহান ইমাম হলেন আহমদ বিন হাম্বল। হাতকড়া পরিয়ে পায়ে জিঞ্জির বেঁধে 'তারসাস' থেকে বাগদাদ পর্যন্ত তাঁকে জনসমক্ষে হাটিঁয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর, রমযানের দিনে তপ্ত রোদ-মাঝে দাঁড় করিয়ে বেত্রাঘাতের পর তাঁকে কারান্তরালে পাঠানো হয়।

৪র্থ হিজরী শতাব্দীঃ

মনসুর আল-হাল্লাজ তাঁর নিজযুগের বিখ্যাত সুফি-সাধক ছিলেন। তাঁকে গ্রেফতারের পর চাবুক মেরে কারাগারে অন্তরীণ করে রাখা হয়েছিল। পরবর্তীতে তাঁর হাত-পা কেটে ফেলে, এমনকী শেষ পর্যন্ত তাঁকে ফাঁসিতে লটকিয়ে হত্যা করা হয়।

৫ম হিজরী শতাব্দীঃ

এমনকি ধর্মান্ধ ওই আলেমদের গোঁড়ামি থেকে ৫ম হিজরী শতাব্দীর বিখ্যাত ও স্বনামধন্য ইমাম, আল-গাজ্জালীও রেহাই পান নি। তাঁর প্রণীত পুস্তকাদিকে তারা ইসলামি নিয়মনীতি বিরূদ্ধ অপ-আদর্শিক রচনা ঘোষণা দিয়ে তাঁকে লাগামহীন মুক্ত-চিন্তাধিকারী নাস্তিক এবং ধর্মদ্রোহী হিসেবে চিত্রিত করে। তাঁর রচিত মূল্যবান পুস্তকগুলো আগুনে পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয় আর মুসলমানদেরকে তাঁর সাথে কথাবার্তা বলতেও নিষেধ করা হয়। তাঁর অনুগামী যদি কেউ থাকে, তবে তার শিরশ্ছেদ করার আদেশও দেয়া হয়।

৬ষ্ঠ হিজরী শতাব্দীঃ

এ শতাব্দীর ইসলামী সাধক হযরত আবদুল-কাদের জিলানী, যিনি 'সুলতানুস্-সুফি' বা 'বড় পীর' নামে খ্যাত, তাঁকেও সেযুগের দুই শতাধিক আলেম সম্মিলিতভাবে প্রকাশ্যে খোদাদ্রোহী, বিরূদ্ধবাদী, ধর্মভ্রষ্ট, পাষণ্ড ইত্যাদি নিন্দাসূচক বিকৃত উপাধি দিয়ে রেখেছিল।

৭ম হিজরী শতাব্দী:

শেখ আবুল হাসান শায্‌লি এবং শেখ 'আজিজ বিন' আব্দুস-সালাম উভয়েই ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন লেখক ও সূফী-সাধক ছিলেন। তবুও তাদেরকে ধর্মবিশ্বাস ভঙ্গকারী প্রতারক হিসেবে ঘোষণা প্রদান করা হয়।

ভারতীয় উপমহাদেশে 'সাধুদের সুলতান' বলে খ্যাত নিজাম উদ্দিন আউলিয়া-কেও সমকালীন আলেমরা সেযুগে ধর্মত্যাগী-পাষণ্ডই বলতো।

ইমাম ইবনে তাঈমিয়্যাহ অত্যন্ত সম্মানিত পণ্ডিতব্যক্তি ছিলেন, তাঁকে দীর্ঘদিন ধরে মিশরে বন্দি করে রেখে নির্যাতন চালানো হয়েছিল। এমনকি কারারুদ্ধাবস্থায়ই তিনি মারা যান।

শামস ত্যাবরিয়িজ তাঁর নিজযুগে উন্নত চারিত্রিক গুণের অধিকারী বিখ্যাত একজন সুফি-সাধক ছিলেন। তাঁর পরে যারা সুফি-সাধক হয়েছিলেন তাদের অনেকেরই গুরু বা পরামর্শদাতা ছিলেন তিনি। তাঁর ওপর এতটাই নির্যাতন চালানো হয় যে, বেঁচে থাকা অবস্থাতেই তাঁর শরীর থেকে চামড়া ছিলে নেয়া হয়েছিল।

সুপরিচিত গ্রন্থ 'মসনবী' প্রণেতা বিখ্যাত সুফি-সাধক জালাল উদ্দিন রুমী শামস ত্যাবরিয়িজ-এরই শিষ্য ছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধেও 'ধর্মত্যাগী'র ফতওয়া দেয়া হয়েছিল এবং পাশাপাশি তার অনুগামীদেরকেও 'কাফের' ঘোষণা করা হয়।

৮ম হিজরী শতাব্দী:

তারা ছিলেন বিখ্যাত দুই ব্যক্তিত্ব, যাদেরকে এই ৮ম শতাব্দীতে 'ধর্মদ্রোহী' আখ্যায়িত করা হয়েছিল। তাদের একজন হলেন ইমাম ইবনে কাইয়্যম, বেত্রাঘাত করে তার ওপর নির্যাতন নিপীড়ন চালিয়ে তাকে কারারুদ্ধাবস্থায় রাখা হয়। আর অপরজন হলেন সুফি তাজউদ্দীন শিবলি, মোল্লাদের পৈশাচিক তাণ্ডব থেকে একনিষ্ঠ এ সাধকও রেহাই পান নি।

৯ম হিজরী শতাব্দী:

মওলানা আব্দুর রহমান জামি নিজ যুগের একজন স্বনামখ্যাত প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন, অথচ তাকেও 'ধর্মদ্রোহী' রূপে অভিযুক্ত করা হয়।

১০ম হিজরী শতাব্দী:

মাওলানা আহমদ বিহারী (ভারত), একজন শ্রদ্ধেয় ঋষিতুল্য মানুষ ছিলেন। কিন্তু তার লেখার মাঝে ধর্মের প্রতি অবমাননাকর বিষয় বর্ণিত হওয়ার মিথ্যা অজুহাতে তাকে দিল্লিতে শহীদ করা হয়।

একইভাবে সুফি বায়জিদ সারহাদ্দি ইসলামী তত্ত্বদর্শনমুলক নিজ পর্যবেক্ষণী মতামত প্রচারে পেশোওয়ারে গেলে, সেখানে তাকেও একজন ধর্মত্যাগী ও 'ধর্মদ্রোহী' বলে জনসমক্ষে ঘোষণা করা হয়।

১১শ হিজরী শতাব্দী:

সুফি-সাধক আলী সানি একাদশ হিজরী শতাব্দীর একজন মুজাদ্দেদ এবং সংস্কারক ছিলেন। দিল্লির রাজদরবারে মোল্লারা তাকে প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধাচারী বলে অভিযুক্ত করে, আর এজন্য তাকে কারাবাসের শাস্তিভোগ করতে হয়।

সুফি সারমাদ, যিনি আমেরিকা নিবাসী একজন মুসলিম ছিলেন, আর ভারতে স্থানান্তরিত হলে মোল্লারা তার ওপর হামলে পরে এবং বিচারের নামে তার শিরশ্ছেদ করে।

পারস্যবাসী মুহাম্মদ বিন ইব্রাহিম একজন বিখ্যাত তফসীরকারক ছিলেন। তিনি সাধারণ মানুষদেরকে সহজভাবে ইসলামের শিক্ষা বুঝাতে নিজ জীবন উৎসর্গ করে রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি প্রচণ্ডভাবে মোল্লাদের বিরোধিতার সম্মুখীন হোন এবং তারা তাকে 'কাফের' ঘোষণা করে ।

১২শ হিজরী শতাব্দী:

মাওলানা মা'সাম 'আলী শাহ মীর দাক্ষিণাত্যের একজন সুফি-সাধক, দক্ষিণ ভারতের মোল্লারা তার বিরুদ্ধে বিতণ্ডায় জড়িয়ে সেই রাজ্যের বাদশাহ আলি মুরাদ খানকে এই বলে বুঝায় যে, এই ব্যক্তি ধর্মপালন-বিমুখ এক রাজদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক। এই সুফী-সাধককে হত্যা করা হয় এবং তার অনুগামীদেরও দাড়ি মুড়িয়ে নাক-কান কেটে খুন করা হয়।

দিল্লির শাহ ওয়ালীউল্লাহ এই শতাব্দির মুজাদ্দেদ ও সংস্কারক ছিলেন। ভারতের তৎকালীন সরকারি ভাষা ফার্সিতে তিনি পবিত্র কুরআনের অনুবাদ করেন। এতে মোল্লারা তার ওপর প্রচণ্ডভাবে ক্ষেপে যায়। তারা শোর তোলে যে আল্লাহ্‌র পবিত্র কালামকে মূল আরবী থেকে অনুবাদ করা ইসলামী শিক্ষার ভীষণ পরিপন্থী। এমনকী রাফাইনদের দ্বারা তারা তাঁকে মেরে ফেলার হীন চেষ্টাও চালায়, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি অলৌকিকভাবে অক্ষতাবস্থায় রক্ষা পান।

সেযুগে, একজন নাজদি আরব, শেখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাব ইসলামের একজন সংস্কারক ছিলেন। তিনি ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতাও বটে। তাঁকে মক্কা নগরের মুফতি এবং পবিত্র ক্বাবার ইমাম দ্বারা 'কাফের' ঘোষণা করা হয়। এটি সর্বজনবিদিত যে, সৌদি আরবের বাদশাহ্ ও রাজপরিবার সহ অধিকাংশ আরব এখন ওয়াহাবি সম্প্রদায়ভুক্ত।

১৩শ হিজরী শতাব্দী:

ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের ধারক মওলানা আব্দুল্লাহ গজনবি, দৃঢ়চেতা ও পাণ্ডিত্যের কারণে আফগানিস্তানের সম্মাণিত এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। অর্ধশিক্ষিত নিম-মোল্লারা আফগান রয়্যাল কোর্টে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তাকে বহিষ্কার করায়। তৎকালীন আমির স্বীয় রাজত্বকালে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করায় তিনি নির্বাসিত ছিলেন। পরবর্তী আমীরের রাজত্বকালে তিনি নিজ দেশে ফিরে এলে তাঁকে অপমানিত এবং লাঞ্ছিত করে কারাগারের অন্ধকারে নিক্ষেপ করা হয় আর সেখানেই তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

মাওলানা মোহাম্মদ কাসিম নানতুবি ছিলেন দিল্লির ওলী খ্যাত শাহ আব্দুল গনির একজন শিষ্য, আর বিখ্যাত ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান দেওবন্দ (ভারত) মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা। মাওলানা কাসিম ইসলামের সপক্ষে অপ্রতিরোধ্য দুর্লভ যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপনকারী একজন বিতার্কিক এবং বিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন।

মক্কার ১২ (বারো) জন আর মদীনার ৩২ (বত্রিশ) জন উলামা তাঁর বিরুদ্ধে 'কুফর'এর ফতওয়া প্রদান করে, কারণ তিনি মনে করতেন যে, কোন এক নবীর আগমনও মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'খাতামান্নাবীঈন'– 'নবীগণের সীলমোহর'এর অত্যুচ্চ মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান রহিত করতে পারে না।

(চলবে)

সংবাদ

মজলিস আনসারুল্লাহ ঘাটুরার উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

অত্যন্ত শান ও শওকতের সাথে মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঘাটুরার উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন জনাব মোশারফ হোসেন, রিজিওনাল নাযেম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সিলেট রিজিওন। কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পরিবেশন করেন যথাক্রমে জনাব এস এম মবিবুল্লাহ্, এস এম হাবিবউল্লাহ্ ও এস এস এম নইম উল্লাহ্। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর মানব প্রেম, রসূল করীম (সা.)-এর সততা ও পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য। রসূল করীম (সা.)-এর কওতে কুৎসি (পবিত্র করণ শক্তি) মানব সেবায় হযরত নবী করীম (সা.) এ বিষয়গুলির উপর বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে জনাব আমীর মাহমুদ ভুঁইয়া, নায়েব রিজিওনাল নাযেম। মোহাম্মদ মুসা মিয়া, প্রেসিডেন্ট আ.মু.জা. ঘাটুরা, সামসুদ্দীন আহমদ মাসুম মুরব্বী সিলসিলাহ, এস এম ইব্রাহীম, ভাইস প্রেসিডেন্ট আ.মু.জা. ঘাটুরা।

অতঃপর সভাপতি সাহেবের সমাপনি ভাষণও দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। আনসারুল্লাহ্ সদস্য ছাড়াও খোদ্দাম ও লাজনাসহ মোট ১১০ জন উপস্থিত ছিলেন।

এস এম আব্দুল হক

হোসনাবাদ জামাতের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৬-০১-২০১৮ রোজ মঙ্গলবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, হোসনাবাদ এর উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা হোসনাবাদ ভুইয়া বাড়ি খোলা জায়গায় সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত জলসায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক সাহেব, সেক্রেটারী মাল, আ.মু.জা. হোসনাবাদ। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব সেলিম হোসেন, মোয়াল্লেম আ.মু.জা. ছোনটিয়া। নযম পরিবেশ করেন জনাব ফজলুল হক। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নবুওয়তের পূর্বের জীবন নিয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক সাহেব। মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ নিয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ রুহুল বারী, মুরব্বী সিলসিলাহ, আ.মু.জা. বানিয়াজান ও জনাব মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান রাজীব, মোয়াল্লেম আ.মু.জা. হোসনাবাদ। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে উক্ত জলসা সমাপ্ত হয়। মেহমান সহ মোট ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

জাকারিয়া আহমেদ

নাটাই মজলিস আনসারুল্লাহর উদ্যোগে মহান সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

নাটাই মজলিস আনসারুল্লাহর উদ্যোগে গত বৃহস্পতিবার ২৫ জানুয়ারি বাদ মাগরিব এ মহান সীরাতুন নবী (সা.) জলসার আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রিজিওনাল নাযেম আলা জনাব মোশারফ হোসেন,কুরআন তেলাওয়াত করেন এস এম হাবিবুল্লাহ নায়েব রিজিওনাল নাযেম আলা,নযম পরিবেশন করেন এস এম তৌফিক বেলাল ,বিষয়ভিত্তিক বক্তৃতাপর্বে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ (আ), এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন নায়েব রিজিওনাল নাযেম আলা,আমীর মাহমুদ ভূঁইয়া, শান্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (আ)এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন মাওলানা জহির উদ্দীন আহমদ মুরুব্বী সিলসিলাহ ,মহানবী (সা.)-এর শান ও মোকাম এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন এস এম হাবিবুল্লাহ । পরে অনুষ্ঠানের সভাপতি মোশারফ হোসেনের সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন নাটাই মজলিস আনসারুল্লাহর যয়ীম হাশেম উল্লাহ শিকদার । অনুষ্ঠানে চারজন জেরে তবলীগসহ একজন এলাকার বিশিষ্ট সালিশকারক মুহাম্মদ তাহের মিয়া এবং আনসার ১৬ জন, খোদ্দাম ৮ জন উপস্থিত ছিলেন ।

হাশেম উল্লাহ শিকদার
যয়ীম নাটাই, মজলিস আনসারুল্লাহ।

নূরনগর ইশ্বরদিতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নূরনগর ইশ্বরদিতে গত ২৬৩/০১/২০১৮ তারিখ শুক্রবার জুমুআর নামাযের পর স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান সাহেবের সভাপতিত্বে সীরাতুন নবী (সা.)-এর জলসা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ তৌফিক জামান (মাহী) নযম পাঠ করেন তালাহা মুবাশ্বের (মুনিম)। এরপর আলোচনা পর্বে হযরত মুহাম্মদ (সা.) জীবনের অনুপম আদর্শের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোচনা করেন যথাক্রমে জনাব মুহাম্মদ সাব্বির আহমদ খান, মোহাম্মদ তৌফিক জামান, মোহাম্মদ ইয়াসির আহমদ (তুষার) জনাব মাওলানা মুহাম্মদ বিপ্লব শাহ্ মুরুব্বী সিলসিলা ও পরিশেষে সভাপতির আলোচনার পরে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সর্বমোট ২৩ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

মুহাম্মদ সাব্বির আহমদ খান

লাজনা ইমাইল্লাহ্ রাজশাহীর স্থানীয় তালীম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ৯/০১/২০১৮ তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ্ রাজশাহীর স্থানীয় তালীম তরবিয়তী ক্লাস সারাদিন ব্যপী উদযাপন রকা হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেন মোহতরমা মোবারাকা মনি, দোয়া পরিচালনাা করেন মোহতরমা আকলিমা খাতুন। পরে কুরআন ক্লাস, দোয়া ও নামায এর ওপর ক্লাস নেওয়া হয়। সকল বিশ্বাসের মূলভিত্তি আল্লাহ্ তা'লা-এর ওপর আলোচনা করেন মোহতরমা সাজলিনা রহমান। অতঃপর মাওলানা সালাহ্ উদ্দীন (পর্দার আড়াল থেকে) মেয়েদের উর্দু পাঠ শিক্ষা দান করেন। পরে বিবাহ জীবন পুস্তকের ওপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। মোহতরমা শামীমা আখতার "কুরআন যাবতীয় কল্যাণ" বিষয়ের ওপর বক্তব্য পেশ করেন ইজতেমায় অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে একজন মেহমানসহ সর্বমোট ৪৩ জন লাজনা উপস্থিত ছিলেন। একজন বয়াত গ্রহণ করেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

আকলিমা খাতুন

কৃতি ছাত্রী

আমার বড় মেয়ের পক্ষের নাতনী মোবারাকা তাহমিদা মিরা, পিতাঃ সাহেদুর রহমান বকুল, মাতাঃ মরিয়াম সিদ্দিকা মেরী, দাদা মতিয়ার রহমান খান, উথলি, ২০১৭ সালের জে,এস,সি পরীক্ষায় গোল্ডেন এ প্লাস পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন- আলহামদুলিল্লাহ।

ভবিষ্যতে সে যাতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারে সেই স্মৃতি শক্তি আল্লাহ্ তা'লা যেন তাকে দান করেন তার জন্য আহবাবে জামাতের খেদমতে বিনীত দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ মোস্তফা পাটোয়ারী

শোক সংবাদ

আমরা অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, শালগাঁও-এর সদস্যা আনোয়ারা বেগম, (স্বামী মরহুম মোহাম্মদ কালাগাজী) গত ০২/০১/২০১৮ তারিখ রোজ মঙ্গলবার বিকাল প্রায় ২টায় ইন্তেকাল করেন। ইন্নলিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি প্রায় ১৭ বৎসর যাবৎ ডায়াবেটিস ও হৃদরোগে আক্রান্ত ছিলেন। মরহুমার জানাযার নামায পড়ান তাঁরই প্রিয়পুত্র মৌলবী শাহ আলম খান মোয়াল্লেম, ওয়াকফে জাদীদ। শালগাঁও জামাতের নিজস্ব কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। মরহুমা তারুয়া জামাতের শহীদ আব্দুর রহিম সাহেবের বড় মেয়ে ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি ২ ছেলে, ৩ মেয়ে ও নাতি-নাতনীসহ অনেক গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি বহু গুণের অধিকারিণী মহিয়ষী নারী ছিলেন।

আহমদীয়াত গ্রহণের কারণে তাঁর স্বামী যখন অন্যান্য অ-আহমদীদের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছিলেন, তখন তিনি তাঁর স্বামীকে অত্যন্ত সাহসিকতা ও ধৈর্যের সাথে আহমদীয়াতে অবিচল থাকার ব্যাপারে সহযোগিতা দিয়েছেন। আহমদীয়াতের শতবার্ষিকী জুবিলী উদযাপন উপলক্ষে প্রদত্ত সকল মসনুন দোয়া তার মুখস্ত ছিল ও আমল করতেন। তিনি শালগাঁও লাজনা ইমাইল্লাহ্'র জেনারেল সেক্রেটারীসহ বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করেন। মরহুমা জামাতের ছেলেমেয়েদের কুরআন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তায় প্রেসিডেন্ট সাহেবের অনুরোধে মক্তব চালু করেন। দীর্ঘ ৫ বৎসর একাধারে তিনি এ নেকীর কাজ করেছেন। তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায় করতেন, বাদ ফজর কুরআন তেলাওয়াতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁর তেলাওয়াতের শব্দে অনেক সময় আমাদের ঘুম ভাঙ্গত। তিনি হার্টের অসুখ ও ডায়াবেটিস রোগী হওয়া সত্বেও ফরয রোযা ও নফল ইবাদত করতে ভুলতেন না। খেলাফতের খলীফাগণের যে কোন নির্দেশ পালনে তিনি সচেষ্ট থাকতেন। সন্তানদের জন্য দোয়া করতেন। দয়াময় আল্লাহ্ তা'লা যেন মহিয়ষী এ নারীকে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা দান করেন জামাতের সকল ভাই বোনগণের সমীপে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

মরহুমার সন্তানদের পক্ষে
মাওলানা শাহ আলম খান মোয়াল্লেম

শোক সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দক্ষিণ আহমদী পাড়া হালকার প্রবীণ লাজনা আমেনা খাতুন স্বামী মরহুম ফরিদ আহমদ গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ রোজ বৃহস্পতিবার বেলা ১২.৩০ টায় ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৮৬ বছর। মরহুমা মুসীয়া ছিলেন। তাঁর ওসীয়্যত নম্বর-৮৯৫৮৮।

মৃত্যুকালে তিনি ৭ মেয়ে ও ২ ছেলেসহ আত্মীয় স্বজন ও অনেক শুভাকাঙ্খী রেখে গেছেন। তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনার জন্য জামাতের সর্বস্তরের ভাই বোনদের নিকট খাস দোয়ার আবেদন করছি।

শামীম আহমদ
মরহুমার ছেলে
আ.মু.জা. ব্রাহ্মণবাড়িয়া

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কোড্ডায় ৩য় আঞ্চলিক সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

পরম করুণাময় খোদা তা'লার অশেষ রহমত ও কৃপায় গত ৫ ও ৬ জানুয়ারি-২০১৮ রোজ শুক্রবার ও শনিবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কোড্ডায় ৩য় আঞ্চলিক সালানা জলসা (বি-বাড়িয়া, সিলেট ও কিশোরগঞ্জ) অত্যন্ত শান্তি ও কল্যাণময় পরিবেশে সুসম্পন্ন হয়েছে (আলহামদুলিল্লাহ্)। প্রথম দিন শুক্রবার বাদ জুমুআ বিকাল ৩.০০ ঘটিকা হতে জলসার কার্যক্রম শুরু হয়। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের আমীর মোহতরম মোবাশশের উর রহমান সাহেব। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, দোয়া ও নযম উর্দু পরিবেশনার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম শুরু হয়। অতঃপর জামা'তের বিদগ্ধ আলেম ওলামাসহ খ্যাত ধর্মবেত্তাগণ ইসলামের মূল শিক্ষা, কুরআন করীমের শ্রেষ্ঠত্ব, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবনাদর্শ ও শেষ যুগে আগত হযরত মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর দাবীর সত্যতা ও তাঁর জামা'ত কর্তৃক বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও প্রসার হওয়া বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন। একই ভাবে ২য় দিন অনুরূপ বিষয়াদির উপর আলোচনার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম চলে। এই জলসায় তিন অঞ্চলের মোট ত্রিশটি জামা'তের সদস্য অংশগ্রহণ করেন। ১৬ জন সদস্য-সদস্যা জলসায় বয়া'ত গ্রহণ করে আহমদীয়াতের জামা'তভুক্ত হন, (আলহামদুলিল্লাহ্)। স্থানীয় অ-আহমদী নেতৃবৃন্দ ও রাজনৈতিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আমাদের জলসার সহায়তায় উল্লোখযোগ্য অবদান রেখেছেন। তাদের সহযোগিতার কাছে আমরা আন্তরিকভাবে ঋণী।

উল্লেখ্য যে, স্থানীয় চেয়ারম্যানসহ, বিভিন্ন দলের দলনেতা, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ জলসায় উপস্থিত হয়ে আমাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ধন্য করেছেন। মহান আল্লাহ তাদের এই শুভ ও সুন্দর চিন্তা-চেতনাকে কল্যাণমন্ডিত করুন।

জলসায় আনসার, খোদ্দাম, আৎফাল, লাজনা ও নাসেরাত এবং নন-আহমদী ১৩৯ জন মেহমানসহ সর্বমোট ২০৬৯ জন সদস্য-সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

আমরা আমাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও হুযূর (আই.)-এর ঐকান্তিক দোয়ার বদৌলতে এমন একটি বরকতময় জলসা জামাতকে উপহার দিতে পেরেছি বলে মহান খোদাতা'লার দরবারে একান্ত কৃতজ্ঞ। পরিশেষে যারা নিঃস্বার্থভাবে নিরলস সেবা দিয়ে আমাদের জলসাকে ফলপ্রসূ করেছেন তাদের জন্য খাকসার খাস দোয়ার আরজ করছি।

খাকসার
এনামুল হক
জেনারেল সেক্রেটারী
আ. মু. জা. কোড্ডা

মানুষের সাথে ভাল কথা বল

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا...

'হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সহজ সরল কথা বল।'...

(সূরা আহযাব: ৭০)

মহানবী (সা.) বলেছেন:

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

'যে আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে তার উচিত, হয় সে ভাল কথা বলবে না হয় সে নীরবতা পালন করবে।'

(বুখারী, কিতাবুল আদব)

*** শুভ বিবাহ ***

গত ২৫/১০/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ হালিমা আক্তার শিলদি, পিতামৃত-শুকুর আলী, গ্রামঃ দেওয়ানটুলি, মাহিগঞ্জ, জেলা-রংপুর এর সাথে কাওছার হোসেন, পিতামৃত- গোলাম হোসেন, রমজান বেগ, মুন্সিগঞ্জ-এর বিবাহ ৫০০০১/- (পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪৫২/১৭।

গত ১০/১১/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ শাহিদা আক্তার, পিতা- মোহাম্মদ আকবর হোসেন, বাড়ি নং-৮০, রোড নং-০৩, ওয়ার্ড নং-০১, উত্তর নন্দীপাড়া রসূলবাগ-এর সাথে মোহাম্মদ জাকির হোসেন, পিতামৃত- মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, ৩৩৮/২, পূর্ব নাখাল পড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-এর বিবাহ ২০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪৫৩/১৭।

গত ২৭/১০/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ খাদেজা আক্তার, পিতা- মোহাম্মদ মাহমুদ মানিক, বাড়ি ৪নং ওয়ার্ড, লালবাগ ঢাকা, (আজিমপুর হালকা)-এর সাথে মোহাম্মদ আতাউর আহমদ, পিতামৃত- কাশেম আলী, শালশিড়ি, ফুলতলা, পঞ্চগড়-এর বিবাহ ১,২০,০০০/- (১লক্ষ ২০ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪৫৪/১৭।

গত ২৬/১০/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ মৌসুমী খাতুন, পিতামৃত- শেখ মোহাম্মদ আলী, তেবাড়িয়া, নাটোর-এর সাথে মোহাম্মদ জামাল হোসেন বাদল, পিতা- মোহাম্মদ আবদুল খালেক, সাকতোলা, সদরদক্ষিণ কুমিল্লা-এর বিবাহ ৪,০০,০০১/- (চার লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪৫৫/১৭।

গত ২৮/০৯/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ তাহমিনা আক্তার (পলি), পিতা- আবদুল আযীয, বানিয়াযান, বলদি আটা, ধনবাড়ী, টাংগাইল-এর সাথে মোহাম্মদ এস, এ মোজাফফর আহমদ নিজামী, পিতামৃত- এস, এ নিজামী, মনরোভিয়া রোড-১, লেইন-২, দক্ষিণ খুলশি, চট্টগ্রাম-এর বিবাহ ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪৫৬/১৭।

গত ০৩/১১/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ নুসরাত জাহান (সুরভী), পিতা- মোহাম্মদ ইসহাক ফকির, গ্রামঃ মিঠাব, ডাকঘর, মাছুমাবাদ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ-এর সাথে গোলাম মোস্তফা, পিতামৃত- আব্দুর রৌফ, সাং-১৬০০ হোল্ডিং-১৩, তিতাস গ্যাস রোড, কদমতলী-এর বিবাহ ৫,০০,০০১/- (পাঁচ লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪৫৭/১৭।

গত ১০/১১/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ শিরিন আক্তার, পিতামৃত- মাজেদ মিঞা, ৩নং ঝিল, পূর্ব ফিরোজশাহ কলোনী, চট্টগ্রাম-এর সাথে মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, পিতা- মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, পশ্চিম চতর, জয়দেবপুর, গাজীপুর-এর বিবাহ ২,৪০,০০০/- (দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪৫৮/১৭।

গত ০৪/০৮/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ শারমিন আক্তার মুনা, পিতা- মোহাম্মদ মোতালিব হোসেন খান, আহমদনগর, ধাক্কা মারা, জেলা-পঞ্চগড়-এর সাথে হামিদ আহমদ দীপ, পিতা-মোহাম্মদ মসিউর রহমান, বিপিএটিসি সাভার, ঢাকা-এর বিবাহ ৩০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪৫৯/১৭।

গত ১১/১১/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ শ্রাবণী খাতুন দিনা, পিতা- মোহাম্মদ খোকন আলী, গ্রাম-ফকির পাড়া, দামুরহুদা, চুয়াডাংগা, কুষ্টিয়া-এর সাথে মোহাম্মদ খোরশেদ আলম, পিতা- মোহাম্মদ হায়জুদ্দিন, গ্রাম-ভাতগাঁও, ডাকঘর-সুন্দরপুর, উপজেলা-কাহারোল, দিনাজপুর-এর বিবাহ ১৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪৬০/১৭।

গত ১০/১১/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ শাওলিন জাহান (তৃষা), পিতা মরহুম- জি, এম, মুসলিম, ২৯/৩ নং মিশনপাড়া, নারায়ণগঞ্জ-এর সাথে শেখ রাফিউজ্জামান (রাফি), পিতা- শেখ মোহাম্মদ আসলাম, কান্দিপাড়া, ব্রহ্মণবাড়িয়া-এর বিবাহ ১,০০,০০১/- (একলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪৬১/১৭।

গত ০১/১২/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ তাসমিন আক্তার মুনা, পিতা মরহুম- হাজী আবুল হোসেন, ১২/১, রোড নং-১৪ ধানমন্ডি-এর সাথে মোহাম্মদ নূর হোসেন, পিতামৃত-মোহাম্মদ মহিউদ্দীন পাহলোয়ান, ২৫/এ মনেশ্বর ১ম লেন, বি, জি, বি ৫নং গেইট, হাজারীবাগ, ঢাকা-এর বিবাহ ১,২০,০০০/- (একলক্ষ বিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪৬২/১৭।

গত ২০/১২/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ সাইফা আক্তার তারিন, পিতা- মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, বাড়ী নং-৪০৭, শান্তি পাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর সাথে ইমতিয়াজ হাসান মিতুল, পিতামৃত- এম এ সালাম, পূর্ব কাজলা সামাদনগর, যাত্রাবাড়ী, মাতুয়াইল, ঢাকা-১৩৬২-এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪৬৩/১৭।

গত ২৫/১২/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ ফারিয়া নাসরিন, পিতা- হারুনুর রশিদ, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রাম, ১৪নং এয়ারপোর্ট রোড, পতেঙ্গা চট্টগ্রাম-এর সাথে মোহাম্মদ মুফতি মাহমুদ মৌসাদ, পিতা-মাজেদ আহমদ ভুইয়া, ১৬৩ শিমরাইল কান্দিপাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর বিবাহ ৩,০০,০০১/- (তিন লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪৬৪/১৭।

গত ০৪/০৯/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ আফরোজা আক্তার সুমি, পিতা- আরিফ আহমেদ বাবুল, ধানিখোলা, মধ্যভাটি পাড়া, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ-এর সাথে মোহাম্মদ শাহিনুর রহমান, পিতা- মরহুম আব্দুল হামিদ, মোল্লা, চন্দ্রপুর, নাটোর-এর বিবাহ ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪৬৫/১৭।

গত ০৮/১২/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ পান্না পারভীন, পিতামৃত বাক্কার তরফদার, বড়ভেটখালী, পোঃ যতীন্দ্রনগর, থানা-শ্যামনগর, জেলা-সাতক্ষীরা-এর সাথে মোহাম্মদ রাজীব আহমদ চৌধুরী, পিতা-মরহুম আবদুস সাত্তার চৌধুরী-এর বিবাহ ৬৫,০০০/- (পয়ষট্টি হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪৬৬/১৭।

গত ২২/১২/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ খাদিজা ইসলাম (নাভিদ), পিতা- এস, এম, রবিউল ইসলাম, গ্রাম- মিরগাং, পোঃ যতীন্দ্রনগর, স্যামনগর, সাতক্ষীরা-এর সাথে ডাঃ এস, এম, মাহমুদ আহমদ (পল্লব), পিতাঃ এস, এম, আবু আহমদ, গ্রাম-পোঃ যতীন্দ্রনগর, সাতক্ষীরা-এর বিবাহ ৬৬,০০০/- (ছয়ষট্টি হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪৬৭/১৭।

গত ২২/১২/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ আসমা আক্তার, পিতা- মোহাম্মদ খোরশেদ আলম, গ্রাম- চরদুঃখীয়া, পোঃ গণ্ডামারা, থানা-ফরিদগঞ্জ, জেলা-চাদপুর-এর সাথে মোহাম্মদ আব্দুর রহিম, পিতা- মোহাম্মদ খাজা আহমদ, গ্রাম- চরদুঃখীয়া, পোঃ গণ্ডামারা, থানা-ফরিদগঞ্জ, জেলা-চাদপুর-এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪৬৮/১৭।

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) গত ২ অক্টোবর, ২০১৫ ইং, রোজ শুক্রবার লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে জুমুআর খুতবায় নিম্নোক্ত তিনটি দোয়া বেশি বেশি পড়ার প্রতি জামা'তের সকল সদস্যকে নসীহত প্রদান করেন।

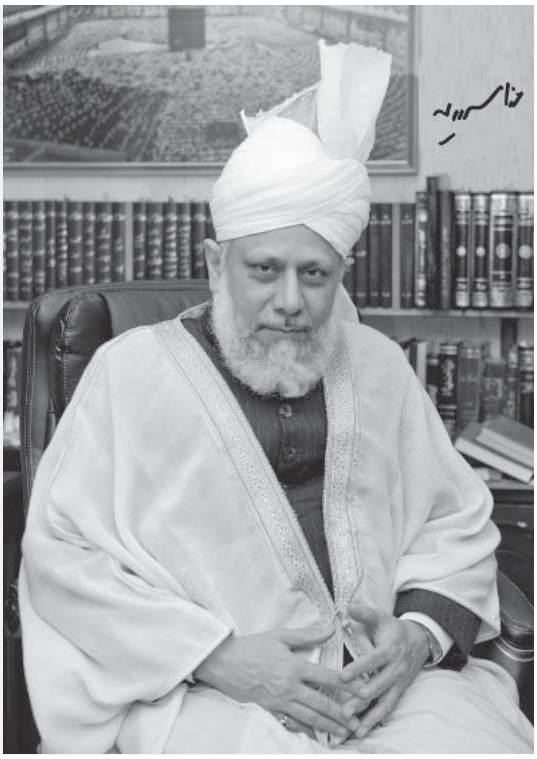

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ
رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফাযনী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী।"

অর্থ : হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএব, হে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ
وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্‌আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থ : হে আমার আল্লাহ্! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ
حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠٢﴾

"রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াকিনা আযাবান্নার।"

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে এ দুনিয়াতে এবং পরকালে যাবতীয় মঙ্গল দান কর এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।

*** এছাড়া হুযূর (আই.) ইস্তেগফার করার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন।**

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ
ذَنْبٍ وَّ اَتُوْبُ اِلَيْهِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ : আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

মানব জাতির সুরক্ষায় এক সতর্কবাণী

হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)
১৯০৬ সালে জগদ্বাসীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে
সতর্ক করে ভবিষ্যদ্বাণী
করেছেন-

তোমরা কি এসব ভূমিকম্প এবং বিপদাবলীর কবল থেকে নিজেদের নিরাপদ ভাবছ ? কখনো না ! সেদিন সকল মানবীয় কার্যকলাপ নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে প্রচন্ড ভূমিকম্প হয়েছে আর তোমাদের এদেশ এসব থেকে নিরাপদ একথা মনে করোনা ! আমি লক্ষ্য করছি, তোমরা সম্ভবত এর চেয়ে বেশী বিপদের সম্মুখীন হবে।

হে ইউরোপ ! তুমিও নিরাপদ নও। হে এশিয়া ! তুমিও সুরক্ষিত নও। হে দ্বীপবাসীরা ! কোন কৃত্রিম খোদা তোমাদের সাহায্য করবেনা। আমি শহরগুলোকে ধ্বংস হতে দেখছি, জনপদগুলোকে জনমানবশূন্য প্রত্যক্ষ করছি।

সেই এক অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবত নীরব ছিলেন এবং তাঁর সামনে অনেক জঘন্য অন্যায় সংঘটিত হয়েছে আর তিনি নীরবে সব সহ্য করেছেন। কিন্তু এখন তিনি রুদ্রমূর্তিতে স্বরূপ প্রকাশ করবেন। যার শোনার মত কান আছে সে শুনে নিক, সে সময় দূরে নয়। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্র করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী।

আমি সত্য সত্যই বলছি, এদেশের পালাও ঘনিয়ে আসছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে আর লুতের দেশের ঘটনা তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করবে। তবে খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর; অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হবে। যে খোদাকে পরিত্যাগ করে, সে মানুষ নয়, কীট। যে তাঁকে ভয় করেনা, সে জীবিত নয়, মৃত।”

(হাকীকাতুল ওহী, বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা : ২১৫)

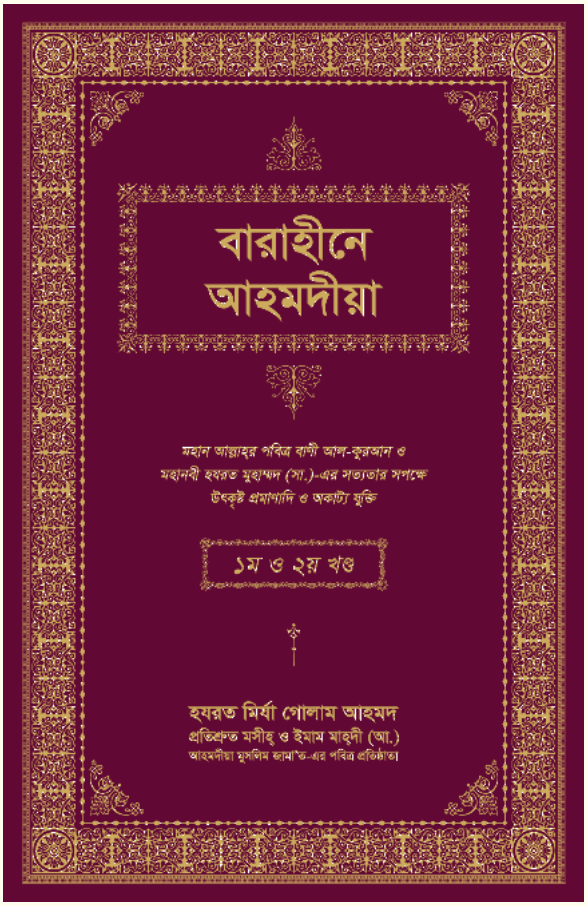

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ কৃপায় যুগান্তকারী ও অবিস্মরণীয় পুস্তক **'বারাহীনে আহমদীয়া'**র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তিনি তাঁর নিজ কৃপায় এ অসাধারণ পুস্তকটির অনুবাদ প্রকাশ করার আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন। এর পুরো নাম **'আলবারাহীনুল আহমদীয়াহ্ আলা হাক্কীয়্যতে কিতাবিল্লাহীল কুরআনে ওয়ান্ নবুয়্যাতীল মুহাম্মদীয়াহ্'** অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার সপক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি।

'বারাহীনে আহমদীয়া'র মোট পাঁচটি খণ্ড রয়েছে। ২৩ খণ্ডে প্রকাশিত রূহানী খাযায়েন-এর প্রথম খণ্ডে রয়েছে বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম চার খণ্ড আর পঞ্চম খণ্ডটি রয়েছে একুশতম খণ্ডে। এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমবার প্রকাশ হয়।

বহুল প্রতিক্ষিত এ পুস্তক, যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর দাবির পূর্বেই রচনা করেছিলেন এবং যেই পুস্তক সম্পর্কে সেই যুগে ভারতবর্ষে বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত এ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছেন যে, বিগত তেরশ' বছর যাবত ইসলামের সপক্ষে এমন অসাধারণ সেবা প্রদান কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি, যা এ পুস্তকের মহান লেখক করে দেখিয়েছেন।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

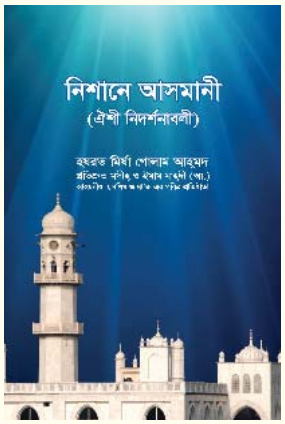

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) **'নিশানে আসমানী'** গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় ১৮৯৬ সালে প্রণয়ন করেন।

এ বইটির মধ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ঐ সব বুযূর্গের মধ্য হতে দুইজন বুযূর্গ মজযুব গোলাব শাহ্ এবং নেয়ামতউল্লাহ্ ওলী'র সেসমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছেন যা ইমাম মাহ্দী আগমনের লক্ষণাবলী ও সত্যতা প্রকাশ করে।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.) উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

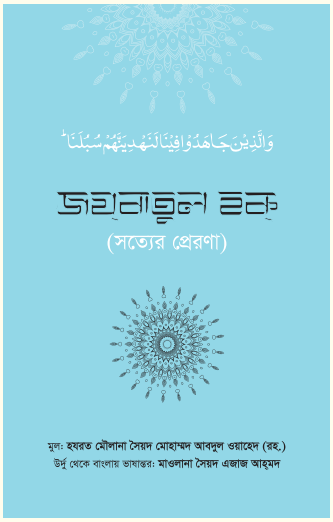

জয্বাতুল হক্ (সত্যের প্রেরণা) ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রখ্যাত আলেম হযরত মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ (রহ.) সাহেবের আধ্যাত্মিকতার পথে মহাসংগ্রামের ধারাবাহিক বিবরণ। তিনি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়ে আত্মিক প্রশান্তির সাথে ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রথম খলীফার হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। তার নিজের লেখা বইটি (মূল উর্দু) ছাপাখানায় থাকা অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

পরবর্তীতে তার সুযোগ্য সন্তান মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। চাহিদার প্রেক্ষিতে এখন তার উত্তরসূরিগণ পুনরায় যথাযথ অনুমোদন নিয়ে বইটি পুনঃপ্রকাশ করেছেন।

আমরা আশা করি যারা এই বইটি পড়বেন তারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হেদায়াত লাভের প্রেরণা পাবেন। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল। বইটির শুভেচ্ছা মূল্য ২০/- টাকা মাত্র।

New Vol. No. 80 | 15th Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

15th February, 2018 | Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

তোমরা যদি জান যে, আগামীকাল কেয়ামত হবে, তবে আজ হলেও একটি গাছ লাগিয়ে যাও– বৃক্ষ রোপণ সদকায়ে যারিয়া।

আল হাদীস

সুবংশে সুসন্তান শুধীজনে কয় সুবীজে সুফসল জানিবে নিশ্চয়

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
সাবেক ন্যাশনাল আমীর

ধানসিড়ি রেস্তোরাঁ

ধানসিড়ি রেষ্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪
আমাদের কোথাও কোন শাখা নেই

"জিসমী ইয়াতীরু ইলাইকা মিন শাওক্বিন 'আলা ইয়া লাইতা কানাত্ কুওওয়াতুত্ ত্বাইরানী"

তোমার পানে আমার দেহ উড়ে চলে যেতে যে চায়
থাকতো যদি সাধ্য আমার ভর করে সেই স্বপ্নডানায়
-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

MTA INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com